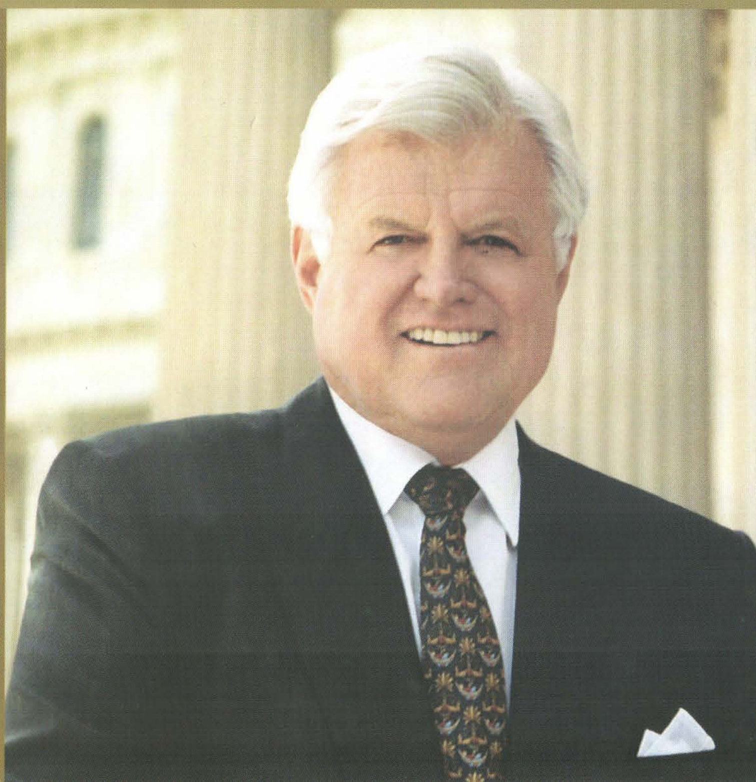
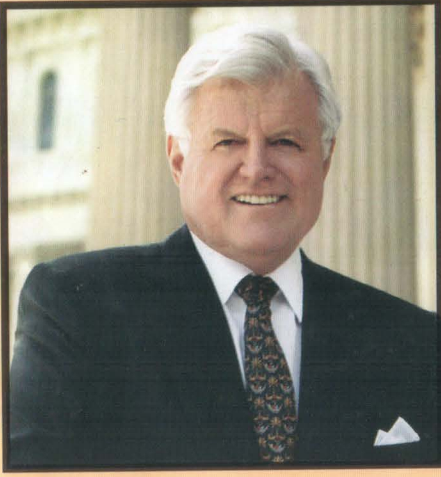
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এডওয়ার্ড কেনেডি ও আমেরিকার ভূমিকা

তপন কুমার দে





১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধীতা করার কারণে চীন এবং আমেরিকাকে আমাদের দেশের মানুষের বিরাট এক অংশ অনেকটাই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু দুটি দেশকে একদৃষ্টিতে বিচার করা উচিৎ নয়, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে। কারণ, আমেরিকার সরকার বিরোধীতা করলেও বিরোধীদলীয় নেতা এডওয়ার্ড কেনেডিসহ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, শিল্পী-সাহিত্যিকসহ সেখানের জনসাধারণের বিরাট অংশই আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে। শুধু সমর্থনই নয়, তারা বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সাহায্য-সহযোগীতা করে। এ গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধে এডওয়ার্ড কেনেডি ও সেখানকার মানুষের ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রচ্ছদ : আককাস খান



তপন কুমার দে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার হিংগানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম পঞ্চানন্দ দে এবং মাতার নাম ঊষা রাণী দে। তিনি স্কুল জীবনেই ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত হন। রাজনৈতিক কারণে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রেপ্তার হন এবং প্রায় দুই বছর বন্দি থাকার পর ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তি লাভ করেন। কারাজীবনের পর তিনি পুনরায় লেখাপড়া শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পর লেখালেখিতে মনোযোগ দেন। তার প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ১. মুক্তিযুদ্ধে টাঙ্গাইল, ২. মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজ, ৩. মুক্তিযুদ্ধে ৪নং সেক্টর ও মে.জে.সি. আর দত্ত বীর উত্তম, ৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা, ৫. রক্তাক্ত পনেরই আগস্ট ১৯৭৫, ৬. আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ, ৭. একাত্তরের বীর বাঙালি, ৮. গণহত্যা একাত্তর, ৯. নারীমুক্তি আন্দোলনের খণ্ডচিত্র, ১০. একাত্তরের গণহত্যা রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম, ১১. বাঙালি বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু, ১২. জাতির পিতা ও স্বাধীনতার ঘোষণা, ১৩. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মাস্টার দা সূর্যসেন ও বীরকন্যা প্রীতিলতা, ১৪. ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা, ১৫. বাংলাদেশের মঠমন্দির, ১৬. স্মরণীয় বরণীয় যারা, ১৭. বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের কথা, ১৮. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলন, ১৯. আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা, ২০. বাংলাদেশের কয়েকটি জনগোষ্ঠী, ২১. ৭ মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযুদ্ধ, ২২. স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধু, ২৩. স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দিন আহমদ, ২৪. ১৯৭১-এর রণাঙ্গনের বীরমুক্তিযোদ্ধা, ২৫. জিন্নার ষড়যন্ত্রের পাকিস্তান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, ২৬. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশে আক্রান্ত ভগবান বুদ্ধ, ২৭. মুক্তিযুদ্ধে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে
এডওয়ার্ড কেনেডি ও আমেরিকার ভূমিকা
তপন কুমার দে



মেরিট ফেয়ার • ২৭৪
প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে বইমেলা ২০১৩

প্রকাশক
এম. মহ্সিন রুবেল
মেরিট ফেয়ার প্রকাশন
১২, বাংলাবাজার (শিকদার ম্যানসন)
ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৭৭৪৮৯৪৭, ০১৭১৫৫৬৬৭৫২
Email : meritfair@gmail.com

প্রচ্ছদ
আব্বাস খান

কম্পোজ
ইফাজ কম্পিউটার

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ৫ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০

দাম ১২৫ টাকা

Bangladesher Muktijuddhe Edward Kenedi O Amerikar Bhumika
Written & edited by Topon Kumar Dey, Published by M. Mohsin Rubel, Merit Fair Prokashon, 12, Banglabazar (Sikder Mansion), Dhaka-1100

Price Tk. 125.00 US $ 10 ISBN: 984-70131-0273-2

উৎসর্গ

শহীদ অধ্যক্ষ নূতন চন্দ্র সিংহকে



ভূমিকা

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিশ্বশক্তি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক শিবির দাঁড়ায় বাঙালির স্বাধীনতার পক্ষে, অপর শিবির দাঁড়ায় পাকিস্তানি বর্বর সামরিক শাসকদের পক্ষে।

বাঙালির স্বাধীনতার জন্য দাঁড়ায় ভারত, রাশিয়াসহ বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক শক্তি। অপরদিকে পাকিস্তানি বর্বর খুনী শাসকদের পক্ষে দাঁড়ায় আমেরিকা, চীনসহ মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানিদের পক্ষে সমর্থন দিলেও সেখানে বিরোধী দলসহ দেশের সর্বসাধারণের বিরাট এক অংশ বাঙালির স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন জানায়। বিশেষ করে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডিসহ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী সিনেটর আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন দেন। এছাড়াও আমেরিকান শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ স্বাধীনতার পক্ষে অসামান্য অবদান রাখেন যা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে।

কেনেডিসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন সুধীজনের লেখার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এডওয়ার্ড কেনেডি ও আমেরিকার ভূমিকা নামক গ্রন্থে। গ্রন্থটি পাঠ করে বাঙালি জাতির দুঃসময়ে আমেরিকার ভূমিকা সম্পর্কে জানা যাবে।

গ্রন্থটি রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় প্রকাশনা সংস্থার উপ-পরিচালক মি. ভবরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। এজন্য তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় মেরিট ফেয়ার প্রকাশন-এর স্বত্বাধিকারী স্নেহধন্য এম মহসিন রুবেলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তপন কুমার দে

সূ চি প ত্র

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এডওয়ার্ড কেনেডি ও আমেরিকার ভূমিকা

তপন কুমার দে

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু সরকারের অন্যান্য শাখা এবং বিভিন্ন স্তরের অবস্থান এরকম ছিল না। কংগ্রেসে বাংলাদেশের জন্য সমর্থন ছিল শক্তিশালী। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরেরও ভিন্নমত ছিল। পত্রপত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন ছিল ব্যাপক। আমেরিকার বাঙালি মহল সর্বতোভাবে মুক্তিযুদ্ধে নানা ধরনের সহায়তা করেন। এক পর্যায়ে পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনগুলোতে কর্মরত সব বাঙালি বাংলাদেশের পক্ষে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। দেশের সর্বত্র আমেরিকানরা বাঙালিদের বন্ধু অথবা সাহায্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করে জনমত গঠন করে এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এবং শরণার্থী কেন্দ্রে বাঙালিদের নানা ধরনের সাহায্য প্রদান করেন। মার্কিনমুলুকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণকালে সমসাময়িক মানসিকতা ও প্রেক্ষিত বিবেচনা করা দরকার।

১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট কার্টার যখন এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন তা ছিল অভিনব এবং বিশ্ব কূটনৈতিক সম্পর্কে এক নতুন মাত্রা। মুক্তিযুদ্ধে লিপ্ত নানা গোষ্ঠীকে তখনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত হয়নি। বরং তাদের তখন বিচ্ছিন্নতাবাদী বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী হিসেবেই অবজ্ঞা করা হতো। স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে ধারণা ছিল খুবই ট্রাডিশনাল। একটি দেশের এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীর উপর গণহত্যা শুরু করলেও তাকে মনে করা হতো এটা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং এ নিয়ে অন্য কারো উচ্চবাচ্যের অধিকার স্বীকৃত হতো না। এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সব দেশই মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সমর্থন দিতে ইতস্তত করে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় আমেরিকার বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন মাত্রায়। আমেরিকার বাঙালি সমাজ, ভারতীয় গোষ্ঠী, পাকিস্তানি মহল, মার্কিন বুদ্ধিজীবী মহল বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গন, মার্কিন মানবিক সাহায্য সংস্থা গোষ্ঠী যার একটি বড় অংশ হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মীয় বা গির্জাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। মার্কিন আইন পরিষদ-সিনেট ও প্রতিনিধি হাউজ, প্রশাসনের নানা স্তরের

আমলা মহল এবং নীতি নির্ধারণের উচ্চতর স্তর অর্থাৎ নিক্সন কিসিঞ্জার রোজার্স মহল সবাই মুক্তিযুদ্ধে কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাবিত বা আন্দোলিত হয়। জাতিসংঘের সদর দপ্তর আমেরিকায় অবস্থিত এবং পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দূতাবাস ওয়াশিংটনে আছে বলে বৈদেশিক কূটনৈতিক মহলেও মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। শুধু দুইটি নির্দিষ্ট মহল ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানের পৈশাচিক হামলা এবং বর্বর কর্মকাণ্ডের কোনো সমর্থন কখনো দেখা যায়নি। এই দুইটি নির্দিষ্ট মহল ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর পাকিস্তানি গোষ্ঠী এবং নির্বাহী বিভাগের নীতি নির্ধারক উচ্চতর মহল প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী গোত্রীয় নেতৃবর্গ। মূলত নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি।

মার্কিন কংগ্রেস সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর পার্লামেন্ট। প্রেসিডেন্ট যেসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যথা মন্ত্রী বা মন্ত্রী গোত্রীয় প্রশাসক, বিচারপতি ও রাষ্ট্রদূতদের নিযুক্তি দেন তাদের অনুমোদন করে সিনেট। বাজেটের উপর সম্পূর্ণ অধিকার কংগ্রেসের এবং তাঁরা অনেক সময়েই সরকারকে সাময়িকভাবে অচল করে দেয়। কংগ্রেসের দুই কক্ষের কমিটিগুলো শুধু আইন খতিয়ে দেখে না তাঁরা কঠোরভাবে নির্বাহী বিভাগের কর্মকাণ্ড তদারকি করে, পর্যালোচনা করে এবং প্রয়োজনে দিকনির্দেশনা দেয়। কংগ্রেসের শুনানি হয় প্রকাশ্যে এবং নির্বাহী বিভাগ বস্তুতই থাকে তটস্থ। জনপ্রতিনিধিরা নির্বাহী বিভাগ থেকে যে-কোনো তথ্য দাবি করতে পারেন এবং তাদের প্রশ্ন খুব যত্নের সঙ্গে এবং দ্রুতগতিতে বিবেচনা করা হয়।

১৯৭১ সালে যদিও প্রেসিডেন্ট নিক্সন ছিলেন রিপাবলিকান দলের কিন্তু কংগ্রেসের দুই কক্ষেই ডেমোক্রেটিক দলের সদস্যরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। সবগুলো কংগ্রেশন্যাল কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডেমোক্রেটিক দলের। ডেমোক্রেটিক দলের অনেকেই সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এপ্রিলের প্রথম দিনেই দুজন সিনেটর ম্যাসাচুসেটসের এডওয়ার্ড কেনেডি এবং ওকলাহোমার ফ্রেড হ্যারিস বাংলাদেশের সমস্যার উপর বক্তব্য রাখেন। রক্তপাত বন্ধ করা এবং দুঃস্থদের সাহায্য করা তাদের দাবি। এই

দুই সিনেটরই ছিলেন ডেমোক্রেট। প্রতিনিধি পরিষদে প্রথম বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কের রিপাবলিকান সদস্য সেমুর হেলপার্ন। ৭ এপ্রিলে তিনি বক্তৃতার সঙ্গে হারভার্ডের তিন অধ্যাপকের একটি প্রতিবেদনও পেশ করেন। হার্ভার্ডের ডিন এডওয়ার্ড মেসন, অধ্যাপক রবার্ট ডর্ফফ্যান এবং অধ্যাপক স্টিফেন মার্গলিন পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। হারভার্ডের তখন ছাত্র ড. আলমগীর মুহিউদ্দিন (পরবর্তীতে ইফাদ খ্যাত) ছিলেন এই কাজের উদ্যোক্তা। এসব গুণী ব্যক্তি অভিমত দেন যে পাকিস্তানে সামরিক নিষ্পেষণ বন্ধ করতে মার্কিন উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্য এক নৈতিক দায়িত্ব এবং পাকিস্তানে সবরকম সাহায্য ত্বড়িৎ স্থগিত করা উচিত। তাদের মতে দক্ষিণ এশিয়া সংকটের একমাত্র সুষ্ঠু সমাধান হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থান। তাদের মতে বাংলাদেশ হবে পশ্চিমা প্রভাব বলয়ের বন্ধুভাবাপন্ন, সম্ভাবনাময় একটি উন্নয়নশীল দেশ। একই সঙ্গে রিপাবলিকান দলের চিন্তাকোষ রিপন সোসাইটিও এমনি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে; এটির রচয়িতা ছিলেন সোসাইটির সভাপতি লি আউসপিজ আর হারভার্ডের দুজন অধ্যাপক স্টিফেন মার্গাল আর গুস্তাভ পাপানেক। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রোনাল্ড ইডেন এবং এডওয়ার্ড ডিমকের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় আর একটি প্রতিবেদন। সেখানে বলা হয় যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিবেচনায়ও স্বাধীন বাংলাদেশ একটি উত্তম এবং অবশ্যম্ভাবী সমাধান। এইসব প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করেই বুদ্ধিজীবীরা চুপ থাকেনি। উনত্রিশ জন প্রখ্যাত পণ্ডিত ১৪ এপ্রিলে ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজে পুরো পৃষ্ঠা নিয়ে একটি আবেদন ছাপেন। তাঁরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে গণহত্যা বন্ধ করতে আহ্বান করেন। কংগ্রেসে শুধু বক্তৃতাই চলেনি বরং ১৫ এপ্রিলে নিউজার্সির রিপাবলিকান সিনেটর ক্লিফোর্ড কেইস এবং মিনেসোটার ডেমোক্রেটিক সিনেটর ওয়াল্টার মন্ডেইল যৌথভাবে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তাদের প্রস্তাবের বিষয় ছিল পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য ও সরবরাহ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা। সিনেটর পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করে ১৯৭১ সালের মে মাসের ৬ তারিখে।

ভারতীয় সংগঠিত গোষ্ঠী এবং মার্কিন সুশীল সমাজের নানা প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানি বর্বরতায় প্রথমে হতবাক ও পরে ক্রুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আওয়াজ তোলেন। তাঁরা ভারতে বাঙালি শরণার্থীদের

জন্যও সোচ্চার ও সচেষ্ট হন। নানা জায়গায় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ছাড়াও নিউইয়র্কে একটি ইন্ডিয়ান কেন্দ্রীয় কমিটি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে নানা উদ্যোগ নেয়। জোয়ান বায়েজের বাংলাদেশের সমর্থনে প্রথম কনসার্ট হয় ১৯৭১ সালের জুলাইয়ের ২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্টামফোর্ড ক্যাম্পাসে। ওস্তাদ রবিশংকর এবং আলী আকবর খানও কনসার্ট অনুষ্ঠান করেন বাংলাদেশের সমর্থনে। ভারতের সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ জুন মাসে ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে র‍্যালিতে যোগ দেন এবং সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেন। নানা ক্যাম্পাসে বাঙালিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতীয়রা স্বাক্ষর অভিযান চালান, টিটইন প্রোগ্রাম করেন ও আলোচনা সভার আয়োজন করেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার শরণ সিং দুইবার এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একবার আমেরিকা সফর করেন।

মার্কিন শিক্ষাবিদ, উন্নয়নকর্মী, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় গোষ্ঠী, গবেষক, বুদ্ধিজীবী যাদের বাংলাদেশ বা উপমহাদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান অথবা উৎসাহ অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁরাই মুক্তিযুদ্ধে আগ্রহী হন। বাংলাদেশ থেকে এপ্রিলের শুরুতে যেসব মার্কিন নাগরিকদের উদ্বাসন করা হয় তারা প্রত্যেকেই হন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বিশেষ। এরা সবাই নানা এলাকায় বাংলাদেশ বন্ধু সমিতি গড়ে তোলেন ও চাঁদা সংগ্রহ করেন। চিঠি লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, সংবাদ সম্মেলন করে তারা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে তদ্বির করেন এবং জনমত গড়ে তোলেন। অনেক সংগঠিত প্রচেষ্টার মধ্যে নাম করা যায় ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার, ফিলাডেলফিয়ার ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল, ডেন্ডারবিল্টের ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ, মিশিগানের ইস্ট বেংগল ইমারজেন্সি রিলিফ ফান্ড এবং নিউইয়র্কের দুইটি প্রতিষ্ঠান– আমেরিকান ফ্রেন্ডস ফর বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ একশন কোয়ালিশন।

ওয়াশিংটনে ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপনে মূলত উদ্যোগী হন বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন এবং বোস্টনে কর্মরত একদল ডাক্তার যারা ঢাকার সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে (সি. আর. এল.) কোনো-না-কোনো সময়ে কাজ করতেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে (আই. সি. ডি. ডি. আর. বি.) পরিণত হয়। জনস

হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. উইলিয়াম গ্রীনো, বোস্টনের ডা. জেমস, আনা টেইলর, ডা. ডেভিড ন্যালিন, ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথের ডা. রবার্ট নর্থরুফ, ডা. নবার্ট হার্সহর্ন এবং ঢাকা থেকে উদ্বাসিত ডা. জন ও করনেলিয়া রোডি, ডা. লিংকন ও মাটি চেন এবং ডা. রিচার্ড ক্যাশ এবং আরও অনেকে ছিলেন এই নিবেদিত দলের সদস্য। এদের সঙ্গে হাত মিলান শিকাগোর শিক্ষাবিদ ড. এডওয়ার্ড ডিমক এবং ডা. রোলান্ড ইন্ডেন এবং ওয়াশিংটনের এনায়েত রহিম, আব্দুর রাজ্জাক খান, মহসিন সিদ্দিক, চার্লস এশটন, জোন ডাইন এবং ফরহাদ ফয়সল। ১৯৭১ সালের মে মাসে অনানুষ্ঠানিকভাবে এই কেন্দ্রের সূচনা হয় এবং জুনে কংগ্রেসের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে এই কেন্দ্র চালু করা হয়। ডা. গ্রীনো ছিলেন এই কেন্দ্রের সভাপতি। এই কেন্দ্রটি হয় একটি উত্তম লবিইস্ট সংস্থা এবং কংগ্রেসে নানা উদ্যোগে বিশেষ করে পাকিস্তানকে মার্কিন সাহায্য থেকে বঞ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কংগ্রেসে পাকিস্তানকে মার্কিন সাহায্য বন্ধ করার জন্য সিনেটর স্যাক্সবি চার্চ এবং হাউসে গালাকসির সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই সংশোধনীর পক্ষে তদ্বির করা ছিল সেন্টারের প্রধান কাজ। ১৯৭১ সালে সেপ্টেম্বরে সেন্টারে দুজন সার্বক্ষণিক পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। তাদের একজন ছিলেন বর্তমানে চেইস মানহাটান ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেভিট ওয়াইজব্রড এবং অন্যজন ছিলেন আজারবাইজান জাতিসংঘ শরণার্থী কমিশনের বর্তমান প্রতিনিধি কায়সার জামান কচি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর ১৯৭২ সালের ২৩ মে এই সেন্টার অবলুপ্ত হয়। ইনফর্মেশন সেন্টার সিআরএল গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। ফিলাডেলফিয়ার ফ্রেন্ডস অব ইস্ট বেঙ্গল স্থাপনে উদ্যোগ নেন পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, বিশেষ করে ড. রিচার্ড কান এবং ড. ক্লাউস ক্রিপেনডর্ফ, ডেলাওয়ার উপত্যকার বাঙালি নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে নিউজার্সির (বর্তমান ওয়াশিংটনে পেন্টাগনে কর্মরত) এ. এম. মজহারুল হক টুনু এবং তার স্ত্রী ফরিদা হক এবং ফিলাডেলফিয়ার কোয়েটার গোষ্ঠীর ফ্রেন্ডস সোসাইটি, বিশেষ করে রিচার্ড টেইলর। এই সমিতি বাংলাদেশের জন্য জোর প্রচার চালায় এবং নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও

বাল্টিমোরে নানা র‍্যালির আয়োজন করে। বাল্টিমোর ও ফিলাডেলফিয়ায় অবরোধ করে তারা পাকিস্তানের জন্য জাহাজে সমরাস্ত্র সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। তারা পিকেট করে, ডিঙ্গি নিয়ে জাহাজ অবরোধ করে এবং পরিশেষে লংশোর ম্যানদের কনভেনশনে তদ্বির করে, পাকিস্তানের জন্য সমরাস্ত্র জাহাজে তোলা নিষিদ্ধ করে দেয়। ফিলাডেলফিয়ায় তারা আলোচনা সভা, বক্তৃতা, টিচ-ইন অথবা ভোজসভার আয়োজন করেন।

মূলত এই গোষ্ঠীর উদ্যোগে এবং ওয়াশিংটন ইনফর্মেশন সেন্টারের সহযোগীতায় ১৯৭১ সালের অক্টোবরে ওয়াশিংটনে এবং নভেম্বরে নিউইয়র্কে একটি ভিন্নধর্মী বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ভারতে প্রচুর শরণার্থী দমদমে অদূরে পরিকল্পিত সল্টলেক সিটিতে আশ্রয় নেয়। ভারতে প্রচুর শহর গড়ে তোলার জন্য অনেক কংক্রীট পাইপ সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই সব সিউয়ার পাইপেই শরণার্থীরা আশ্রয় নেয়। ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের সামনে লাফায়েত পার্কে এই রকম নকল শরণার্থী আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। সেখানে স্বেচ্ছাসেবীরা শরণার্থীদের মতো কাপড়চোপড় পরে শাড়ি-লুঙ্গি গায়ে দিয়ে, ডালভাত বা খিচুড়ি খেয়ে সিউয়ার পাইপে এক নাগাড়ে দশ দিন অবস্থান করে। এই র‍্যালিতে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যোগদান করেন। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং আরও অনেকে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলাপ করেন, তাদের সঙ্গ দেন ও তাদের সঙ্গে প্রার্থনায় শামিল হন। নভেম্বরে এই র‍্যালিই নিউইয়র্কে দাগ হেমারশোল্ড প্লাজায় সাত দিন ধরে চলে এবং সেখানেও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হাজিরা দেন; কবি এলেন গিনসবার্গ তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই বিক্ষোভের উদ্দেশ্য ছিল শরণার্থীদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা এবং পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন সরকারের সমর্থন প্রত্যাহার করার জন্য চাপ প্রয়োগ।

নিউইয়র্কে ড. হোমার জ্যাকের ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অব রিলিজিয়ন ফর পিস, ড. জয়ন্ত ভট্টাচার্যের জাতিসংঘে করেসপন্ডেটস এসোসিয়েশন এবং জন সালজবুর্গের ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টস বাংলাদেশের বিশেষ বন্ধু। ড. হোমার জ্যাক এবং ড. জয়ন্ত ভট্টাচার্যের দপ্তর হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের আড্ডাখানা। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিউইয়র্কে পৌঁছলে

ড. জয়ন্ত ভট্টাচার্য তার সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করে দেন। ড. হোমার জ্যাক নভেম্বর মাসে ওয়াশিংটনে স্বেচ্ছাসেবী ও সাহায্য সংস্থাদের এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৯৭১ সালের ১০ থেকে ১২ নভেম্বর এই সম্মেলন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সংকটে আমেরিকান প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ নিয়ে, আর এতে সভাপতিত্ব করেন ড. হোমার জ্যাক।

এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, এতে বক্তব্য রাখেন নিউজার্সির রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান পিটার ফ্রিলিং হায়সেন, শিকাগোর অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডিমক, স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্রুস লেইনগেন এবং বাংলাদেশ মিশনের এনায়েত করিম। পাকিস্তান প্রতিবাদ করে এতে অংশ নিতে বিরত থাকে। এই তিনজন নিবেদিত মুক্তিযুদ্ধ সমর্থক নিউইয়র্কে বাঙালিদের সবরকম সহায়তা করেন। মার্চ-এপ্রিলেই মাহমুদ আলীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ হয়, আর তখন থেকেই তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

ইন্টারন্যাশনের রেস্ক্যু কমিটি (আই.আর.সি) ভারত এবং আমেরিকায় বাঙালিদের নানাভাবে সাহায্য করে। আমেরিকায় অবস্থানকারী বাঙালি শিক্ষাবিদ বা ছাত্রদের দুর্দিনে সাহায্য করার জন্য হারবার্ড ও শিকাগোর শিক্ষক সম্প্রদায় সচেষ্ট হন। আইআরসির অর্থানুকূল্যে তাঁরা একটি ডিসপ্লেসড স্কলারস তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতেও শরণার্থী বাঙালি শিক্ষকদের জন্য আইআরসি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নিউইয়র্কের জমশেদ রেজা খান আরআরসির হয়ে যোগাযোগ রাখতেন।

শিক্ষাঙ্গনে মার্কিন পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে পাকিস্তানের সমর্থক পাওয়া দুস্কর ছিল। তাঁরা একযোগে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। হারভার্ড ও শিকাগোর অধ্যাপকবৃন্দ বাংলাদেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিল্লুর রহমান খান এপ্রিল মাসে তাঁর মার্কিন স্ত্রীর সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করে আমেরিকায় যান। তিনি তখন উইসকনসিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওসকস ক্যাম্পাসে অধ্যাপনা করেন। তিনি ঢাকায় গণহত্যা আর বিশেষ করে শিক্ষক ও ছাত্রহত্যার উপর মার্কিন শিক্ষাবিদদের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। ২২ এপ্রিল ইন্টারন্যাশনের কমিটি অব ইউনিভার্সিটি ইমারজেন্সি (আই. সি. ইউ. ই.)

শিক্ষক ও ছাত্র হত্যার উপর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। এতে অনেক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পণ্ডিতদের নিয়ে বিশ্বের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশোর বেশি শিক্ষাবিদ দস্তখত করেন। ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ল সম্মেলনে এপ্রিল মাসেই নিউইয়র্কে অধ্যাপক গিডন গটলিয়ের মত প্রকাশ করলেন যে বাংলাদেশে গণহত্যা চলছে এবং পাকিস্তানকে নিরত করা আমেরিকার কর্তব্য। বেংগল স্টাডিস কনফারেন্স কমিটি অব কনসানর্ড এশিয়ান স্কলারস, বেঙ্গল ক্রাইসিস কমিটি, আমেরিকান এনথ্রোপলজিকেল সোসাইটি, স্টুডেন্ট ওয়ালর্ড কনসার্ন-এই ধরনের আরও অনেক বুদ্ধিজীবী সমিতি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে আওয়াজ তোলে।

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ কনসার্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিউইয়র্কে মেডিসন স্কয়ার গার্ডেনে এই কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের পয়লা আগস্টে এবং দুইবারে চল্লিশ হাজার শ্রোতা এতে উপস্থিত থাকেন। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর। তারই অনুরোধে মাত্র চার/পাঁচ সপ্তাহের প্রস্তুতিতে এই অনুষ্ঠান হয়। বিটলস ম্যানেজার এলন ক্লাইন এর সমুদয় খরচ বহন করেন এবং এই কনসার্ট পরবর্তীতে রেকর্ডের সব আয় বাংলাদেশ শরণার্থীদের জন্য ব্যয় করা হয়। কিছু বাড়তি তহবিল বাংলাদেশ উন্নয়ন কার্যক্রমে ১৯৭৯-৮০ সালে ব্যবহৃত হয়। এই কনসার্টে অংশ নেন জর্জ হ্যারিসন, রিংগো স্টার, লিয়ন রাসেল, বিলি প্রেস্টন এবং উদীয়মান গায়ক বব ডায়লান। ওস্তাদ রবিশংকর এবং আলী আকবর খানও এতে অংশ নেন।

মার্কিন প্রকাশনা ও প্রচার (মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক) মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে শুরু থেকেই সুনজরে দেখেন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস নানাভাবে বাংলাদেশ সম্বন্ধে মার্কিন উৎসাহ ও আগ্রহ তাঁরা অটুট রাখেন। নিউইয়র্কের বিভিন্ন পত্রিকার প্রচ্ছদে বাংলাদেশ সংকট তিনবার স্থান পায়– ৫ এপ্রিল, ২ আগস্ট এবং ৬ ডিসেম্বর। টাইমসে এই সুযোগ হয় দুবার– ২ আগস্ট এবং ৬ ডিসেম্বর। জাতীয় সংবাদপত্রের কয়েকজন রিপোর্টার এবং বিশ্লেষক সারাবছর ধরেই বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। নিউইয়র্ক টাইমসে ছিলেন সিডনি শ্যানবার্গ, ম্যালকন ব্রাউন, এন্টনি লুইস, বেঞ্জামিন ওয়েলস ও টেড গুলজ। ওয়াশিংটন পোস্টে ছিলেন ডোলিগ হ্যারিসন,

স্ট্যানলি কারনো, জিম হোগল্যান্ড, রনাল্ড কোডেন, লি লেসকাজ, লুইস-সিমনস এবং টেরেন্স স্মিথ। ওয়াশিংটন ইভনিং স্টারে ছিলেন হেনরি ব্যাডশার, জর্জ শারমান এবং ক্রসবি নোয়েস। বাল্টিমোর সান এ ছিলেন এডমি ক্লুইমার, ফিলিপ পটার এবং জন উডরাফ। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে ছিলেন পিটার ক্যান এবং রবার্ট কাটলি। ক্রিশ্চিয়ান সাইন্স মনিটরে ছিলেন হেনরি হেওয়ার্ড, লুসিয়া মুয়াট এবং সাদারল্যান্ড। কলাম লেখকদের মধ্যে শুধু জোসেফ আলসপ নিক্সন পাকিস্তানের পক্ষে কলম ধরেন। জাতীয় সংবাদপত্র ছাড়াও মফস্বলের সংবাদ মাধ্যমেও বাংলাদেশ সংকট হরহামেশা স্থান পেত। পাবলিক ব্রডকাস্টিং-এর (পিবিএস) প্রোগ্রাম ওয়াশিংটনে নিউজ কনফারেন্স, আগ্রানস্কি শো এবং এডভোকেটে বারবার বাংলাদেশ আলোচিত হয়। বাংলাদেশের তরফ থেকে অধ্যাপক রেহমান সোবহান ছিলেন আমেরিকায় প্রথম মুখপাত্র। ১৯৭১ সালের মে মাসে ওয়াশিংটন নিউজ কনফারেন্সে তিনি বক্তব্য রাখেন, আবার অক্টোবরে বোস্টন থেকে জাতীয় প্রোগ্রাম এডভোকেটেও হাজির থাকেন। ন্যাশনেল ব্রডকাস্টিং (এনবিসি) এর কমেন্টস এবং ক্রনোলগ প্রোগ্রামে বাংলাদেশের বিশেষ প্রচার হয়। কমেন্টেসে এ. এম. এ. মুহিত বক্তব্য রাখেন এবং ক্রনোলগ ছিল ২৮ নভেম্বরে বাংলাদেশ সংকটের দু'ঘণ্টাব্যাপী একটি ব্যাপক প্রোগ্রাম। আমেরিকান ব্রডকাস্টিং (এনবিসি)-এর ট্রেড কোপের ছিলেন বাংলাদেশ বিষয়ে একরকম সার্বক্ষণিক রিপোর্টার। তাদের ইসুজ এনন আনসারস প্রোগ্রামে অনেক বিতর্ক হয় যার একটিতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত লক্ষীকান্ত ঝাঁ আর পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগা হিলালি মুখোমুখি হন। আগা হিলালি আর লক্ষীকান্ত ঝাঁ ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধু ছিলেন। তাঁরা দুজনেই ১৯৩৬ সালে আইসিএস-এ যোগ দেন। তবে দেশ বিভাগের পর ওয়াশিংটনেই একসঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। ফক্স টেলিভিশনের ওয়াশিংটন পেনোরমা প্রোগ্রামে আধ ঘণ্টা ধরে লম্বা আলোচনা চলত। এই প্রোগ্রামে একদিন পাকিস্তানের তরফ থেকে বক্তব্য রাখেন আগা হিলালি আর একদিন সমান সময়ের দাবিতে এ. এম. এ. মুহিত হাজির হন সেই প্রোগ্রামে। মফস্বলের রেডিও-টেলিভিশনও কম যেত না। সংবাদ মাধ্যম বস্তুতই ছিল বাংলাদেশের পরম বন্ধু।

১৯৭১ সালের জুন মাসে বিশ্বব্যাংক থেকে একটি মিশন বাংলাদেশে আসে এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। এই মিশন একটি বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। মিশনের নেতা পিটার কারগিল ২৯ জুন প্যারিসে পাকিস্তান দাতাগোষ্ঠীর সভায় তার অভিমত ব্যক্ত করেন। ভীতি ও ধ্বংসের দেশ বাংলাদেশে কোনোরকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ নেই– এটাই ছিল মিশনের অভিমত। দাতাগোষ্ঠী পাকিস্তানকে নতুন সাহায্য দানে বিরত থাকে এবং ঋণ রেয়াতি দিতেও আপত্তি জানায়। শুধু আমেরিকা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি ছিল না। ১২ জুলাই বিশ্বব্যাংকের খসড়া প্রতিবেদন নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়। এই খবরটি ছিল পাকিস্তানের জন্য মারাত্মক। এতে বলা হয় যে বাংলাদেশে ভীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব বহাল, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির এবং সর্বত্রে ধ্বংসলীলা পরিলক্ষিত হয়। কুষ্টিয়া সম্বন্ধে একটি মন্তব্য ছিল ‘শহরটিকে মনে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরিত্যক্ত বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত একটি জার্মান শহর। মানুষ হতবুদ্ধি, আমরা ঘুরতে গেলে সবাই পালিয়ে যায়। এটা যেন ছিল আণবিক আক্রমণের পরবর্তী সকাল।’ ওয়াশিংটনে শেরাটন পার্ক হোটেলে ২৬ সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাংক ও অর্থ তহবিলের বার্ষিক সভা শুরু হয়। সেখানে বাংলাদেশের তরফ থেকে রেহমান সোবাহান এবং এ. এম. এ. মুহিত অনেক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ড. নুরুল ইসলামও (পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান) একদিন যোগ দেন। বাঙালিরা ২৮ তারিখে হোটেলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ২ অক্টোবরে পাকিস্তান দাতাগোষ্ঠীর একটি সভা বসে। এবারেও পাকিস্তানকে সাহায্য প্রদান স্থগিত থাকে। নভেম্বরে এ বিষয়ে আর একবার উদ্যোগ নেবার কথা ছিল কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে কানাডায় টরেন্টো শহরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় বাংলাদেশ সংকট নিয়ে। ১৯ আগস্ট এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত কূটনীতিবিদ ও জাতিসংঘের একজন আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল স্যার হিউ কিনরি সাইড (তখনও তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হননি)। এই সম্মেলনে সারাপৃথিবীর অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ সাংসদ জুডিথ হার্ট, কানাডীয়

সাংসদ এনড্রু ক্রুইন, ভারতীয় রাজ্যসভা সদস্য অধ্যাপক নুরুল হাসান, আইরিশ আইনবিদ নীল ম্যাকযারমট, অধ্যাপক গুস্তাব এবং হানা পাপানেক, অধ্যাপক স্টানলি ওলপার্ট (ভুট্টো ও জিন্নাহর জীবনী লেখক), ড. হোমার জ্যাক, ড. জন এবং করনোলিয়ে রোডি, ভারতীয় জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী, সাংবাদিক অজিত ভট্টাচার্য, মার্কিন কংগ্রেসের স্টাফ টম ডাইন ও মাইক গার্টনার এবং আরও অনেক ব্যক্তি। বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছিলেন মুস্তাফিকুর রহমান সিদ্দিকী এবং এ. এম. এ. মুহিত । দুই দিনের এই সম্মেলনে টরেন্টো ডিক্লারেশন অব কনসার্স ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় পাকিস্তানে সবরকম সাহায্য বন্ধ করে রাখার আবেদন করা হয়, সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান দাবি করা হয়। এবং শেখ মুজিবের মুক্তি ও জীবনের নিশ্চয়তা চাওয়া হয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ওয়াশিংটনে এসে পৌঁছলেন ৪ নভেম্বর। তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে দেখা করেন। কংগ্রেসে আলোচনা করেন এবং বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওয়াশিংটনে তিনি একটি সংবাদ সম্মেলন করেন ৫ নভেম্বরে। নিউইয়র্কে তিনি সভা-সমিতি করেন ও অনেক বক্তব্য রাখেন। এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল বিনাযুদ্ধে সমঝোতার শেষ সুযোগ পরখ করে দেখা। তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সংলাপে তার কোনো আপত্তি নেই, তবে হাত মুষ্টিবদ্ধ থাকলে হাত মেলানো যায় না।" অথবা "একজন অনির্বাচিত ব্যক্তি যিনি সামরিক স্বৈরশাসকও বটে তাকে সমর্থন করে পাকিস্তানকে রক্ষা করা যাবে না।" নিক্সন কিসিঞ্জার বস্তুতই বাংলাদেশের সংকটকে মোটেই পাত্তা দেন বলে মনে হয়নি। তাই শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কোনো আশা নিয়ে তাঁর সফর সমাপ্ত করতে পারেননি। তিনি প্রত্যাবর্তন করলে কিসিঞ্জার পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান মোহাম্মদ খানের সঙ্গে সমঝোতার বিষয় উত্থাপন করেন। অবস্থা গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের উত্তর ছিল যে, ঐ চিন্তা ডিসেম্বরের শেষে তথাকথিত বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিবেচনা করা যাবে। ভারত যখন এক কোটি শরণার্থীর ভারে জর্জরিত, বাংলাদেশ যখন গেরিলা যুদ্ধে সর্বত্র সফল তখন মার্কিন সরকার আর পাকিস্তান একটি পুতুল সরকার গঠনের প্রস্তুতিতে নিমগ্ন। এই ক্ষেত্রে সমাধানের কোনো উপায়ই ছিল না।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকভারত যুদ্ধ শুরু হলো। ৬ ডিসেম্বরে এই যুদ্ধ ভারত বাংলাদেশের যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাবলি ছিল চমকপ্রদ। অতি দ্রুতগতিতে একটি বাহিনী আর একটি বাহিনীকে পরাস্ত করে এগিয়ে যাচ্ছে। এত সহজে আকাশ এত মুক্ত। যুদ্ধক্ষেত্রের এ সঠিক এবং খুঁটিনাটি খবরাখবর সব আগুসার বাহিনীর নখাগ্রে। কিন্তু আমেরিকায় এই সময়ে অভিনীত হয় আরেকটি অনবদ্য প্রহসন, আর সেই নাট্যশালা ছিল জাতিসংঘের সম্মেলন কক্ষ। ৪ ডিসেম্বরেই মার্কিন অনুরোধে যুদ্ধের বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হলো। মার্কিন প্রচেষ্টা হলো কোনোমতে পাকিস্তানকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করা। তাই একের পর এক যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব পেশ হলো। ৪ তারিখে রাশিয়া প্রথম ভেটো প্রয়োগ করল, তারপর ৫ তারিখে আবার। এবার পট পরিবর্তন করে বিষয়টি গেল সাধারণ পরিষদে, সেখানে অকার্যকর প্রস্তাবও পাশ হয়ে গেল ৭ ডিসেম্বরে। ১০ তারিখে কানাঘুষায় প্রকাশ পেল যে পাকিস্তানের পূর্ব কমান্ডের জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করবে এবং এই বিষয়ে জাতিসংঘের মধ্যস্থতা চান। এই আবেদন কিসিঞ্জার সাহেবের কৌশলের শিকার বলে সব ভেস্তে গেল। ১৫ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ আবার বসল পকিস্তানের মনোনীত ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর আহবানে। সেখানে কাগজপত্র তছনছ করে, চোখে পানি এনে ভুট্টো একটি চমৎকার নাটক করে রেগেমেগে সম্মেলন কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর নিরাপত্তা পরিষদ ছাড়াই ১৬ তারিখে ঢাকায় আত্মসমর্পণ হলো। ভারত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একদিন পরে তা মেনেও নিলেন। ভুট্টো দেশের পথে পাড়ি দিলেন। বেশ ক'দিন পরে ২১ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ করল। প্রহসন আর কাকে বলে।

মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশ সংকট সারাটি বছর প্রাধান্য পায়। সেই পয়লা এপ্রিলেই এই বিষয়ে প্রথম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিষয়ে ২১০টি বিবৃতি কংগ্রেসের দুই কক্ষে প্রদত্ত ৪৫ জন সিনেটর আর ৩৬ জন প্রতিনিধি এই বক্তৃতাগুলো দেন। বিবৃতি তো খালি বিবৃতি নয়, প্রায়ই সংযোজিত হয় অনেক সংবাদ, অনেক প্রতিবেদন এবং

অনেক অভিমত। সিনেটর চার্চ এক বক্তৃতা শেষে ৬৮ পৃষ্ঠার সংযোজনী লিপিবদ্ধ করান। এইসব বিবৃতিতে দেখা যায়, বাংলাদেশের জন্য গভীর দরদ ও সহানুভূতি এবং সরকারি নীতির তীব্র সমালোচনা। দুই দলের সদস্যরা মার্কিন পাকিস্তান ঘেঁষা নীতির সমালোচনায় ছিলেন মুখর। কংগ্রেসের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করলে আমেরিকায় কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিবেচিত হয় অথবা প্রভাব বিস্তার করে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির সমর্থনে কংগ্রেস ছিল সোচ্চার এবং এ-ব্যাপারে রাজনৈতিক সমাধান তারা দাবি করেন। সামরিক সরকারকে তারা এ-ব্যাপারে দুইভাবে অভিযুক্ত করেন। গণহত্যা ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের নীরবতায় তারা ক্ষুব্ধ হন এবং এটা বন্ধ করবার জন্য তারা মার্কিন প্রভাবের বলিষ্ঠ প্রয়োগ দাবি করেন। ভারতে বাঙালি উদ্বাস্তুদের ত্রাণকাজে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার জন্য কংগ্রেস আহ্বান জানায়।

সামরিক সাহায্য স্থগিত করা এবং যেসব সমরাস্ত্র সরবরাহ হচ্ছিল তা বন্ধ করা কংগ্রেসের প্রথম দাবি। এই বিষয়ে কংগ্রেসে মোট পাঁচটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৫ এপ্রিলে প্রথম প্রস্তাব করেন সিনেটর কেইস এবং মন্ডেল। প্রতিনিধি পরিষদে এই প্রস্তাবেরই অনুরূপ দুটি প্রস্তাব পেশ হয়। এক মাস পরে এটি পেশ করেন কংগ্রেসম্যান গ্রস আর অন্যটি কংগ্রেসম্যান হেলপার্ন। কিছুদিন পর আবার পয়লা জুলাই তারিখে এই রকম প্রস্তাব দুই কক্ষেই দেওয়া হয়। সিনেটে প্রস্তাব দিলেন ম্যারিল্যান্ডের রিপাবলিকান সিনেটর রবার্ট মেথিয়াস এবং হাউসে ম্যাসাচুসেটসের রিপাবলিকানস কংগ্রেসম্যান ব্র্যাডফোর্ড মোর্স। মার্কিন প্রশাসন এপ্রিল মাসেই ঘোষণা দেন যে, পাকিস্তানে কোনো সামরিক সাহায্য দেয়া হবে না এবং সব সরবরাহ বন্ধ করা হচ্ছে। বারবার এই ঘোষণা সবাইকে জানানো হয়, বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিদের। কিন্তু নিউইয়র্ক টাইমস ২২ জুন সচিত্র খবরে প্রকাশ করে যে পাকিস্তানে মার্কিন সমরাস্ত্র বা সামরিক সামগ্রী সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। এতে কংগ্রেসে বিরক্তি ও ক্ষোভ চরমে পৌঁছে এবং এই প্রেক্ষিতে জুলাই মাসে প্রস্তাবটি আবার পেশ করা হয়। সামরিক সাহায্য বন্ধ করতে নিক্সন সরকার মোটেই উৎসুক ছিল না এবং নানা ছুতোয় এই সাহায্য বহাল

থাকে। সাহায্যের কলেবর বড় না হলেও তাকে অব্যাহত রাখা ছিল পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন প্রকাশের একটি নির্দেশক। অবশেষে কংগ্রেসের নিরবচ্ছিন্ন চাপে ৮ নভেম্বরে সামরিক সাহায্য ও সরবরাহ বন্ধ করা হয়। এই খবরটিও কংগ্রেসের মাধ্যমে প্রকাশ পায়; সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি তাঁর বক্তৃতায় এই তথ্য প্রকাশ করেন। বিভিন্ন হিসেবে ধারণা করা হয় যে সামরিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল পাঁচ মিলিয়ন ডলারের মতো কিন্তু এই ব্যাপারেই নির্বাহী বিভাগ সবচেয়ে বেশি সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং এই বিষয় নিয়েই ভারতের সঙ্গে সবচেয়ে কঠোর মনোমালিন্য।

একবারে শুরুতেই বাংলাদেশে ত্রাণকার্যের প্রতি কংগ্রেস আগ্রহ প্রকাশ করে। সিনেটর হ্যারিস ১৯ এপ্রিল একটি ব্যাপক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাংলাদেশ পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে প্রাধান্য দেয়া হয়। তিনি সামরিক সাহায্য বন্ধের আবেদন করেন। অর্থনৈতিক সাহায্যকে একটি আবদ্ধ তহবিলে জমা দিতে বলেন। যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করবার জন্য আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেন। সর্বোপরি মানবিক সাহায্য ও ত্রাণকাজ চালিয়ে যেতে বলেন এবং আবদ্ধ তহবিলকে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর ব্যবহারের সুপারিশ করেন। ২১ তারিখ কংগ্রেসম্যান শিউর বাংলাদেশ রেডক্রসকে ত্রাণকাজ পরিচালনার জন্য অবাধ অধিকার দাবি করে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ, খাদ্য সরবরাহ, যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ কাজ এসব বিষয় নিয়ে অনেক বক্তব্য প্রদত্ত হয়, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির শরণার্থী সাব কমিটির শুনানিতেও এই বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়। এই সাব কমিটির তিনটি শুনানির একটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ত্রাণকার্য ও মানবিক সাহায্য নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

যে বিষয় সর্বক্ষণের জন্য কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে ভারতের শরণার্থী সমস্যা। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির শরণার্থী সাব কমিটি এই বিষয়ে তিনটি শুনানির ব্যবস্থা করে। প্রথম শুনানি হয় ২৮ জুন, আর এতে অব্যাহত সামরিক সরবরাহ হয়ে ওঠে আলোচনার সবচেয়ে উত্তপ্ত বিষয়। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি গালাগার কমিটির শুনানিতে সাক্ষ্য দেন ১১ মে তারিখে। সেখানেই তিনি শরণার্থীদের সমস্যা ও মানবিক সাহায্যের বিষয় তুলে ধরেন। কেনেডি কমিটির দ্বিতীয় শুনানি হয় ২২ জুলাই। এই

শুনানিতে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হয় আলোচনার মূল বিষয়। ত্রাণকাজ এবং খাদ্য সরবরাহ যে সামরিক বিজয়ের কৌশল হতে পারে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় কী করে ত্রাণ কাজ মানুষের মঙ্গলে নিয়োজিত হতে পারে এই বিবেচনা সবসময়ই গুরুত্ব পায়। পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়ার ফলে বস্তুতই জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। আগস্ট মাসে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি তার কমিটির স্টাফ ডেল ডিহান আর জেরি স্পিকার এবং দুজন বিশেষজ্ঞ ডিন জন লুইস এবং ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক পুষ্টিবিশারদ নেভিন স্ক্রিমশো ভারতে শরণার্থী কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। তাঁদের পূর্ব পাকিস্তানেও যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পাকিস্তান সরকার তা বানচাল করে দেয়। সিনেটর ওয়াশিংটনে ফিরে ২৬ আগস্ট একটি সংবাদ সম্মেলনে এই পরিদর্শনের উপর বক্তব্য রাখেন। এই প্রথম তিনি পাকিস্তানে শুধু সামরিক সাহায্য নয় অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের দাবিও সমর্থন করেন। শরণার্থীকেন্দ্রের বিরাট খরচ নিয়েও তিনি মন্তব্য করেন এবং এ-ব্যাপারে উন্নত দেশগুলোকে আরও উদার হতে আহ্বান করেন। সর্বোপরি তিনি শরণার্থীদের সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশে সামরিক আগ্রাসন থামাবার ব্যবস্থা নিতে বলেন। মার্কিন সাহায্য যাতে পর্যাপ্ত হয় সেজন্য ২৩ সেপ্টেম্বর সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ত্রাণকার্যের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ২৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ চেয়ে বিল পেশ করেন। শেষ পর্যন্ত এই বরাদ্দই বহাল থাকে। কেনেডি কমিটির তৃতীয় শুনানি হয় দুই দিনব্যাপী ৩০ অক্টোবর ও ৪ নভেম্বরে। এইবার ডিন লুইস, অধ্যাপক স্ক্রিমশো এবং আরও অনেকে সাক্ষ্য প্রদান করেন। এ শুনানির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় পয়লা নভেম্বরে, আর তাতে প্রাধান্য পায় সংকট-সমাধানের রাজনৈতিক উদ্যোগ এবং ভারত মার্কিন সম্পর্কের পূর্ণ মূল্যায়ন। দক্ষিণ এশিয়া সংকটের সামগ্রিক বিশ্লেষণের জন্য আরও ক'জন সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান ভারত ও পাকিস্তান সফর করেন। কংগ্রেসম্যান গালাগার ছিলেন প্রথম পরিদর্শক। তিনি জুন মাসে ভারতে যান এবং বাংলাদেশ সীমান্তও পরিদর্শন করেন। সিনেটর পার্সি যান আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। কংগ্রেসম্যান ফ্রিলিংহাউসেন

যান সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। সিনেটর স্যাক্সবি এবং চার্চ যান নভেম্বরে এবং যুদ্ধের পূর্বক্ষণে রণাঙ্গন ত্যাগ করেন। গালাগার এবং চার্চ ছাড়া বাকি সবাই পাকিস্তানেও সফর করেন। এইসব প্রতিনিধিরা বিশেষ করে শরণার্থীদের অবস্থা সরজমিনে পরিদর্শন করেন এবং শরণার্থীদের দুরবস্থা তাদের দৃষ্টি আর্কষণ করে। নিক্সন সরকার মানবিক সাহায্য প্রদানে দরাজ হস্তই ছিল তবে তাঁদের আগ্রহ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে অধিকতর সাহায্য প্রদান করা। শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য মার্কিন সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তানে সাহায্য ব্যবহারের উপায় বিশেষ ছিল না বলে বরাদ্দকৃত বা অংশীদারকৃত সাহায্য খুব কমই ব্যবহৃত হয়। শরণার্থীদের জন্য সাহায্য তত বেশি না হলেও অঙ্গীকার ছিল উদারতার। নির্বাহী বিভাগ ভেবেছিল যে মানবিক সাহায্যে কার্পণ্য না করলে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ও বিনা বাধায় পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন দিয়ে পার পেয়ে যাবে। কেনেডি কমিটি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আর একটি শুনানির ব্যবস্থা করে। এটি ছিল ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে, আর এর বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশ ও ভারতে ত্রাণকাজ ও শরণার্থী পুনর্বাসন।

যে বিষয়টি কংগ্রেসে সবচেয়ে বেশি আগ্রহের সঞ্চার করে আর যে বিষয়ে প্রায় দু'মাস ধরে অনবরত তদ্বির হয় তা ছিল বৈদেশিক সাহায্য আইনের সংশোধন। পাকিস্তানে সবরকম সাহায্য রহিত করার জন্য ফরেন এসিসট্যান্স আইনে একটি সংশোধনী উত্থাপন করা হয়। এই সংশোধনী নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় এপ্রিল-মে মাসে। আইন করে নির্বাহী বিভাগের হাত বেঁধে না দিলে নিক্সন কিসিঞ্জার জুটিকে পাকিস্তানকে সমর্থন থেকে বিরত করা যাবে বলে মনে হয়নি। এই সংশোধনীর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে সিআরএল গোষ্ঠী এবং পরে ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ ইনফর্মেশন সেন্টার ও বাংলাদেশ মিশন। প্রতিনিধি পরিষদে গালাগার আর সিনেটে স্যাক্সবি এবং চার্চ এই উদ্যোগে সাড়া দেন। তাদের সহকারী চার্লস ইউটার, মাইক গার্টনার এবং টম যাইন এই উদ্যোগে বিনিশ্চয়াক ভূমিকা পালন করেন। তাঁরাই সিআরএল গোষ্ঠী, ইনফরমেশন সেন্টার এবং বাংলাদেশ মিশনকে বুদ্ধি দেন, কৌশল প্রণয়নে সাহায্য করেন এবং গোটা লবিংকে যথাপথে পরিচালিত করেন। সিআরএল-এর ডাক্তার জন রোডি

এবং তার স্ত্রী কর্নেলিয়া রোডি এবং জনস হপকিনসের উইলিয়াম গ্রিনোর অবদান চিরস্মরণীয়। ১০ জুনে স্যাক্সবি এবং চার্চ সিনেটে এই সংশোধনী পেশ করে; ১৫ জুনে গালাগার সমতুল্য সংশোধনী প্রতিনিধি পরিষদে পেশ করে। যতদিন না অবস্থা এমন হয় যে শরণার্থীরা নিরাপদে দেশে ফিরতে শুরু করবে ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোনোরকম মার্কিন সাহায্য দেওয়া যাবে না। এই সংশোধনীর জন্য বাঙালি ও আমেরিকানরা নানা অঙ্গরাজ্য থেকে তাদের প্রতিনিধিদের কাছে তদ্বির করেন, ওয়াশিংটনে এসে কংগ্রেসের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়ান, কাগজপত্র দিয়ে প্রতিনিধি এবং তাদের সহকারীদের ব্যতিব্যস্ত রাখেন। বলা হয় যে এত সার্থক এবং এত ব্যাপক লবিং এর আগে আর হয়নি। ৩ আগস্ট প্রতিনিধি পরিষদে বৈদেশিক সাহায্য বিল বিবেচিত হয়। গালাগার সংশোধনীর পক্ষে ভোট হয় ২০০ এবং বিপক্ষে ১৯২। প্রতিনিধি পরিষদে সচরাচর পররাষ্ট্র বিষয়ে নির্বাহী বিভাগের সুপারিশ পাশ হতো। সেই হিসেবে এই সিদ্ধান্ত ছিল নিতান্তই যুগান্তকারী, ইন্ডিয়ানার অধ্যাপক ফজলে বারি মালিক প্রতিনিধি পরিষদে সংশোধনীর জন্য খুব খাটেন ও তদ্বির করেন। তাঁর মতে এর আগে পররাষ্ট্র বিষয়ে প্রতিনিধি পরিষদ কখনো নির্বাহী বিভাগের বিপক্ষে যায়নি।

সিনেটে সংশোধনী বিবেচিত হয় ২৬ থেকে ২৯ অক্টোবরে। বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ে সিনেট অনেক বেশি সচেতন ও সক্রিয়। এতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী ছিল। পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধ, আর কম্বোডিয়ায় কড়া তদারকিতে সাহায্য প্রদান, কেউ হয়তো পাকিস্তান সংশোধনী পছন্দ করেন কিন্তু গ্রিস সংশোধনী চান না। অনেক সিনেটর একেবারেই বৈদেশিক সাহায্য পছন্দ করেন না। অনেকে সামরিক ও অর্থনৈতিক ও মানবিক সাহায্য এক পাল্লায় বিচার করতে রাজি নন। তবে আলোচনায় যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে তা হলো জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তি। মার্কিন সরকার বা কংগ্রেস চীনের অন্তর্ভুক্তি চায় তবে তাদের তাইওয়ানের জন্যও দরদ ছিল। জাতিসংঘে তৃতীয় বিশ্বের সদস্যরা তাইওয়ানকে বিতাড়নে উৎসাহী ছিলেন এবং চীনের অন্তর্ভুক্তিতে তারা অহেতুক উল্লাস প্রদর্শন করেন এবং আমেরিকার শ্রাদ্ধ করেন। কংগ্রেস ঠিক করল যে অকৃতজ্ঞ তৃতীয় বিশ্বকে শাস্তি দিতে হবে। তাই শেষ ভোটে সারাটি ফরেন

এসিসট্যান্স আইন ৪১-২৭ ভোটে পাশ হলো না। এই ভোটে অনেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন না তাই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সিনেটর ভোট দিতেই বিরত থাকেন। অবশ্য বিষয়টি এখানেই শেষ হলো না। ১৯৭১ সালের ৯ থেকে ১১ নভেম্বর সিনেট আবার দুটো বৈদেশিক সাহায্য আইন বিবেচনা করল– একটি হলো সামরিক ও নিরাপত্তা সাহায্য বিষয়ক, আর অন্যটি অর্থনৈতিক ও মানবিক সাহায্য বিষয়ক। এবারে স্যাক্সবি চার্চ সংশোধনীসহ আইন পাশ হলো ১০ নভেম্বরে। প্রতিনিধি পরিষদে বিল পাশ হয়েছে একটি, সিনেটে হলো দু'টি। তাদের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। তাই বিল তিনটি গেল একটি যৌথ কমিটিতে। সিনেটে এবার ফেরত এলো একটি বিল এবং ১৭ ডিসেম্বর তা পাশ হলো। এতে স্যাক্সবি চার্চ সংশোধনী এবং ২৫০ মিলিয়নের ত্রাণ সাহায্য স্থান পেল। তাই এক হিসেবে বলা যায় যে মার্কিন কংগ্রেস শুধু নির্বাহী বিভাগের বিরোধীতাই করেনি বরং বাংলাদেশ সংকটে বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ সমর্থন দিয়েছে।

পাকিস্তানের পক্ষে দু-একটি দুর্বল আওয়াজ যে ওঠেনি তা নয়। মোট ষোলটি বিবৃতিতে নির্বাহী বিভাগের নীতিমালা সমর্থিত হয় অথবা ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার হয়। এর মধ্যে নয়টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয় পাক ভারত যুদ্ধ শুরু হলে এবং পাঁচটি বক্তৃতা করেন ফ্লোরিডার রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান রবার্ট সাইকস আর তিনটি নিউজার্সির রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান পিটার ফিলিংহাউসের। এইসব বিবৃতিতে বক্তারা খুব স্বযত্নে আত্মরক্ষা করেন, সরাসরি রিপাবলিকান সিনেটর রবার্ট ডোল ১২ অক্টোবর নির্বাহী বিভাগের কর্মকাণ্ড ও নীতিমালা সমর্থন করে একটি বক্তৃতা দেন। বাংলাদেশ মুক্ত হবার প্রাক্কালে নিউজার্সির কংগ্রেসম্যান হেনরি হেলস্টোস্কি ৯ ডিসেম্বরে বাংলাদেশের স্বীকৃতি বিষয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সিনেটে এই বিষয়ে শুনানি হয় পয়লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে এবং সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু নিক্সন সরকার অবশেষে স্বীকৃতি প্রদান করে ৪ এপ্রিলে।

বাংলাদেশ সংকটের সমাধানের জন্য প্রথম প্রস্তাব রাখেন সিনেটর হ্যারিস ১৯ এপ্রিলে। তিনি মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করতে বলেন। জুলাইয়ের ৩০ তারিখ মিনেসোটার সিনেটর মন্ডেইল এবং প্রতিনিধি ডোনাল্ড ফ্রেজার একটি

যৌথ প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাশিয়া, চীন ও আমেরিকাকে সংকট সমাধানের জন্য একটি সম্মেলনে বসার আহ্বান করেন। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি এই রকম একটি আবেদন করেন নভেম্বরের শুরুতে। ৫ নভেম্বরে সিনেটর হ্যারিস নিরাপত্তা পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশ সংকট সমাধান বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবটিকেই তিনি ৪ ডিসেম্বর আবার পেশ করেন এবং এতে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন আরও অনেক বিখ্যাত সিনেটর। এই প্রস্তাবে শুধু একটি নতুন কথার অবতারণা করা হয়। বলা হয় যে নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশকে আহ্বান করতে হবে।

পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস একটি মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। নির্বাহী বিভাগ ঢালাওভাবে ভারতকে যুদ্ধবাজ আখ্যা দিয়ে নিন্দা করলে কংগ্রেসে এর প্রতিবাদে রীতিমতো ঝড় উঠল। অবস্থা বেগতিক দেখে নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। সেখানে তিনি বলতে চাইলেন যে নির্বাহী বিভাগ সংকট সমাধানের অনেকটা প্রচেষ্টা চালিয়েছে, নিরপেক্ষভাবে বিষয়টির মোকাবেলা করেছে, তবে ভারত মোটেও নমনীয় ছিল না। এটা নিয়েও তর্কবিতর্ক চলে। পরে জ্যাক এন্ডারসন যখন গোপন তথ্য ফাঁস করতে শুরু করে, তখন দেখা গেল যে কিসিঞ্জারের বক্তব্য ছিল সত্যের অপলাপ। কংগ্রেসে আরও নানারকম গোপনীয় তথ্য প্রায়ই ফাঁস হতে থাকে। মার্কিন নিরপেক্ষতার দাবি নাকচ করে দিলেন সিনেটর আদলাই স্টিভেনসন (৩য়)। ১৩ ডিসেম্বরে তিনি জানালেন যে আমেরিকা নামমাত্র ভাড়ায় পাকিস্তানকে যুদ্ধ জাহাজ ইজারা দিয়েছে। ১৫ তারিখে সিনেটর টমাস হগলটন প্রশ্ন করেন যে কেন মার্কিন আণবিক জাহাজ এন্টারপ্রাইজ বঙ্গোপসাগরে আছে। তিনি আরও বুঝিয়ে দিলেন যে এন্টারপ্রাইজ বিদেশি নাগরিকদের উদ্বাসনে কোনো কাজেই আসবে না। কংগ্রেস সতর্ক ছিল বলেই নিক্সন কিসিঞ্জার নিজেদের ইচ্ছেমতো জটিলতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

কংগ্রেস বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন রক্ষায়ও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ২৭ জুলাই কংগ্রেসম্যান বড্ফোর্ড মোর্সের উদ্যোগে মোট ৫৫ জন কংগ্রেসম্যান প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে একটি চিঠি লেখেন। শেখ মুজিবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং প্রহসনের বিচার বন্ধ করতে তাঁরা আহ্বান জানান। আগস্টের শুরুতে ১১ জন সিনেটর প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আবেদন করেন। প্রতিনিধিরা তাদের বিভিন্ন বক্তৃতায় শেখ মুজিবের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের উদ্বেগ ও আগ্রহ ব্যক্ত করেন। সিনেটর পার্সি এ-ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছ থেকে কথা আদায় করেন। সিনেটর স্যাক্সবি পাকিস্তানে গেলে শেখ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আবেদন করেন অবশ্যই তা অগ্রাহ্য করা হয়। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই মার্কিন কংগ্রেস আলোচনা করে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে প্রয়াস পায়।

মার্কিন প্রশাসনের অন্দরমহলেও বাংলাদেশের জন্য সমর্থনের অভাব ছিল না। সরকারি নীতির বিরোধীতা আইন মাফিক করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ঢাকার সব মার্কিন কূটনীতিবিদ সরকারি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড সবার পক্ষে ভিন্ন মত জানিয়ে দেন। গণহত্যার বিরুদ্ধে আওয়াজ না তোলার জন্য তাঁরা সরকারের নিন্দা করেন। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে সরকারি নীতি শুধু নৈতিকভাবেই অগ্রহণযোগ্য নয় বরং মার্কিন স্বার্থেরও পরিপন্থী। মুক্তিযুদ্ধকালে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ইউ. এস. এ. আই. ডি. এবং কৃষি ডিপার্টমেন্টের অনেক কর্মকর্তা সরকারি নীতির সমালোচনা করেন। তাদের অনেক সুপারিশ উচ্চতর মহলে বাতিল করে দেয়া হয় বা গ্রহণ করা হয় না। কংগ্রেস, সুশীল সমাজ ও প্রচার মাধ্যমের মনোভাব ও সতর্কতা এবং প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ চাপের মুখে নিক্সন কিসিঞ্জার পাকিস্তানকে যতটা সমর্থন করতে চান ঠিক ততটা করতে সক্ষম হননি। সারাটি সংকট নিক্সন কিসিঞ্জার নিতান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিবেচনা করেন এবং সরকারি নীতি একান্তই তাঁরা দুজনে প্রণয়ন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষে কিছু বাঙালি আমেরিকায় প্রচার কাজে যান। তারা সর্বত্র বাঙালিদের দ্বারা পরিত্যক্ত হন

এবং কোথাও লাঞ্ছিতও হন। তাদের বিরুদ্ধে আমেরিকানরাও কোথাও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের শুরুতে যায় রাজশাহীর উপাচার্য প্রয়াত সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন এবং রেডক্রসের সভাপতি বিচারপতি নুরুল ইসলাম (পরবর্তীতে এরশাদের উপরাষ্ট্রপতি)। এছাড়া যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মোহর আলী এবং অধ্যাপক কাজী দীন মোহাম্মদ। তারপর যান ভারী ওজনের মরহুম হামিদুল হক চৌধুরী এবং মাহমুদ আলী। এদের আগমনে পাকিস্তানের ইমেজের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। মাহমুদ আলী পরবর্তীতে পাকিস্তানের জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে আবার যান। আরও দু-একজন বাঙালি সরকারি কর্মচারী পাকিস্তানি দলের সদস্য হয়ে যান তবে তাদের সঙ্গে বাঙালিদের যোগাযোগ মোটেই হয়নি। পাকিস্তানিরা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মানকেও আমেরিকায় পাঠায়। তার কিছুদিন পরেই তাঁর ভাই সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক রাশেদ সোহরাওয়ার্দী একটি বিবৃতি দিয়ে বাংলাদেশের সমর্থন করেন। পাকিস্তানের এই ধরনের উদ্যোগ ছিল নিতান্তই উদ্ভট। উন্মাদ সামরিক জান্তার মুক্ত সংবাদ মাধ্যম এবং স্বাধীন চিন্তাধারা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। মার্কিনমুলুকে সার্বিক পরিবেশ পাকিস্তানের জন্য কী রকম প্রতিকূল যে ছিল সে সম্বন্ধে ইসলামাবাদের মদমত্ত "জানোয়ার" মোটেই অবহিত ছিলেন না।

আমেরিকায় মুক্তিযুদ্ধ পূর্ণ সমর্থন লাভ করলেও মার্কিন সরকার পাকিস্তান ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করে। এই নীতি সর্বতোভাবেই নিক্সন কিসিঞ্জার জুটির নীতি ছিল। তাঁরা বলেন যে পাকিস্তান পুরনো বন্ধু, সিটো-সেন্টোর সদস্য (SATO-CENTO) সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ, তদুপরি পাকিস্তান ছিল চীনের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্ক স্থাপনে দুতিয়াল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি এই জুটির বৈরি ভাবকে কেউ কেউ তাদের পাকিস্তান ঘেঁষা নীতির অজুহাত মনে করেন। কিসিঞ্জার দক্ষিণ এশিয়া সম্বন্ধে তার নিজস্ব বিচারকেই প্রাধান্য দেন। তার হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় উত্তরণের প্রক্রিয়া চলতে পারত। তাই এই সুচিন্তিত ছকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের সহায়তা তাকে খুবই ক্ষুব্ধ করে। তার ক্ষোভের নিদর্শন মিলে তার পরবর্তী ব্যবহারে। ১৯৭৩ সালে তিনি হন মার্কিন সেক্রেটারি

অব স্টেট। ঠিক তখন মরহুম হোসেন আলী বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত হয়ে আমেরিকায় যান। এই নতুন দেশের প্রথম রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার প্রায় দু-বছর সাক্ষাতের জন্য কোনো সময় দিতে ব্যর্থ হন। ১৯৯৫ সালে ভারত ভ্রমণকালে তিনি 'ইন্ডিয়া টুডে'তে দেয়া সাক্ষাৎকারে তার অনুসৃত নীতিকে যুক্তিযুক্ত বলে দাবি করেছেন। তার বই হোয়াইট হাউজ ইয়ারস-এ ৭৬ পৃষ্ঠায় তিনি তার নীতির যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন এবং তার স্বভাবসিদ্ধ ধারায় ইতিহাসের পুনর্বিবেচনা (বা সোজা কথায় বিকৃতি) করেছেন।

কেনেডি ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

আবুল মাল আব্দুল মুহিত

দশদিন আগে আমেরিকা তার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারিয়েছে। এডওয়ার্ড মুর কেনেডি গত বছর মে মাসে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জানা গেল তার মস্তিষ্কে ক্যানসার টিউমার হয়েছে। এই রোগ থেকে ৭৫ বছর বয়স্ক একজন মানুষ যে উঠে দাঁড়াতে পারবেন সে-রকম আশা করার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু সিনেটর কেনেডি জীবনটাকে মনে করতেন একটি উৎসব এবং সেই মনের জোরেই তিনি শুধু উঠে দাঁড়ালেন না বরং পরবর্তী পনেরটি মাস পরিপূর্ণ জীবনযাপন করলেন। ২০০৮ সালের ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশনে হাজির হলেন এবং সেখানে বারাক ওবামার নেতৃত্বে যে পরিবর্তন আসবে তার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এডওয়ার্ড কেনেডি সম্বন্ধে অনেকেই ভাবত যে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবেন। কিন্তু নানা জটিলতার কারণে সে সুযোগটি তাঁর জীবনে হয়নি। কিন্তু দেশের এবং মানবজাতির জন্য তাঁর অবদান কোনো অংশে মার্কিন প্রেসিডেন্টের চেয়ে কম ছিল না। এই যে বাংলাদেশে আমরা তাঁর সম্পর্কে কথা বলছি এবং কলম ধরছি তাতেই প্রমাণিত হয় তার প্রভাব সারাবিশ্বে অনুভূত হয়। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন অকৃত্রিম বন্ধু।

সিনেটর কেনেডি আমেরিকার একজন ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সদস্য। ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের অধিবাসী তাঁর পিতা জোসেফ কেনেডি ছিলেন একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী ও জমিদার এবং একই সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনের একজন নেতা ছিলেন। তিনি আমেরিকার সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান এবং যুক্তরাজ্যে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রোজ কেনেডি যিনি বৃদ্ধ বয়সে পরিবারটির কাণ্ডারী ছিলেন, তিনিও রাজনীতি এবং সমাজসেবায় গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। কেনেডি দম্পতির নয়জন সন্তানের সকলেই ছিলেন কৃতকর্ম এবং চারজন ছেলে সকলের সামনেই ছিল রাজনৈতিক সম্ভাবনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধকালীন প্রথম সন্তান জো জুনিয়র প্লেন বিধ্বস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় সন্তান জন কেনেডি তখনই রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন এবং তিনি

প্রথমে সিনেটর এবং পরবর্তীতে আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর তিন বছর সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ডালাসের এক সফরে আততায়ীর গুলিতে তাকে প্রাণ দিতে হয়।

তার পরবর্তী ভাই বর্বি কেনেডি অত্যন্ত করিৎকর্মা রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে প্রভূত সুনামের অধিকারী হন। তারপরই ছিলেন সিনেটর এবং সর্বশেষে প্রেসিডেন্টের জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তার জীবনের অবসান হয় নির্বাচনের অভিযানের সময় একজন আততায়ীর হাতে। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির বয়স তখন ৩৬ বছর এবং তখন তিনি ছয় বছর ধরে একজন সিনেটর। তখনই অনেকে আশা করে অদূর ভবিষ্যতে এডওয়ার্ড কেনেডি একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন। ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম সেই সুযোগটি তার সামনে আসে কিন্তু চাপাকুইডিকে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কারণে তিনি তখন প্রার্থী হলেন না। এই দুর্ঘটনা সহজে তার পিছু ছাড়ল না, ১৯৭৩ সালেও তিনি নির্বাচনে অবতীর্ণ হলেন না। এবারেও অবশ্যই আরেকটি দুর্ঘটনা তাকে নির্বাচন থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তা ছিল তার পুত্র পেট্রিকের হাড় ক্যান্সার। ১৯৮০ সালে তিনি প্রার্থী হয়েছিলেন কিন্তু নানা কারণে তিনি মনোনয়ন পাননি। তার নিরাপত্তা সমস্যাও তখন একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তখন মনে হয় তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি আর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন না বরং অন্যভাবে দেশসেবা চালিয়ে যাবেন। আমেরিকার যে ক'জন জনপ্রতিনিধি জনসেবায় কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জন্য সুযোগ-সুবিধা করে দেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একেবারে শীর্ষে। এছাড়া তিনি আরেকটি গুরুদায়িত্ব পালন করেন আর তা হলো বৃহৎ কেনেডি পরিবারের একজন কাণ্ডারী। ৪৭ বছর ধরে তিনি ছিলেন ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের মার্কিন সিনেটর এবং একজন আইন প্রণেতা হিসেবে তিনি অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। জনসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা– শিক্ষাপ্রসার, স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা, অভিবাসীদের আবাসন, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা, অপরাধের নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধীদের স্বার্থরক্ষা– এরকম প্রতিটি বিষয়ে তিনি জনহিতকর আইন রচনা করেন। যদিও তার পরিচয় ছিল যে তিনি উদারপন্থীদের অনমনীয় নেতা কিন্তু জনস্বার্থে আইন প্রণয়ন সকল মতের মধ্যে সমঝোতা সাধন ছিল তার এক অসাধারণ কৃতিত্ব। উদারপন্থী সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি যেখানে দেখেছেন মানবাধিকারে দলন অথবা

বঞ্চিতদের নির্যাতন অথবা কোনো অন্যায় জারিজুরি সেখানেই উচ্চারিত হয় তার বলিষ্ঠ কণ্ঠ। তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা করেন এবং সেই সময়ে তিনি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ২৫ মার্চের গণহত্যা শুরু হলে এই বিষয়ে মার্কিন কংগ্রেসে সর্বপ্রথম আওয়াজ তোলেন সিনেটর কেনেডি। ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণের পক্ষ অবলম্বন করেন। তার ক্ষোভ ছিল যে জনগণের দুর্দশায় মার্কিন অস্ত্রের ব্যবহার। তিনি মার্কিন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন বাংলাদশের সহিংসতার অবসান ঘটায়।

একই দিনে আরেকজন সিনেটর হেরিস একই ধরনের বক্তব্য রাখেন। সেদিন থেকে সিনেটর কেনেডির সাথে শুরু হয় আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আমি তখন পাকিস্তান দূতাবাসে অর্থনীতির কাউন্সিলর হিসেবে কর্মরত এবং ঢাকায় পাকিস্তানি হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে খুবই ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত। সেদিন বিকেলে সিনেটর কেনেডিকে ধন্যবাদ দিতে গিয়েছিলাম এবং আমাদের সঙ্কট সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছিলাম। সেদিন তার সাথে আমার দেখা হলো না কিন্তু পরিবর্তে পেলাম তার দুজন সহকর্মীর সংবেদনশীলতা। ডেল ডিহাম ও জেরি টিংকা আমাকে প্রশ্ন করে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। ক'দিন পর তারা আমাকে টেলিফোন করে জানালেন যে ওয়াশিংটনে আইন ও মানবাধিকারের একটি সম্মেলন হচ্ছে এবং সেখানে বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন অধ্যাপক গটলিস্টে এবং তারা আমাকে এই সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানায়। পরবর্তী নয় মাস তারা ছিলেন আমার বন্ধু, সহচর, অবশ্য এই নয় মাসে ওয়াশিংটনের কেপিটেল হিলে আরও অনেক বাঙালি সিনেটর কেনেডির দফতরে গিয়ে হাজির হতেন। আমাদের নানা অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করতাম এবং তার সহানুভূতি এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেতাম। সিনেটর কেনেডি ১১ মে ডিসনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকমিটির শুনানিতে তার দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। এই শুনানির আয়োজন করেছিলেন ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যান গালাগার। বাংলাদেশ যুদ্ধের নয়টি মাসে সিনেটর কেনেডি বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে বারোটি বক্তব্য সিনেটে প্রদান করেন। তিনি ওই সময়ে সিনেটে শরণার্থী উপকমিটির সভাপতি হিসেবে তিনটি শুনানির ব্যবস্থা করেন। প্রথম শুনানি ছিল ২৮ জুনে। এই শুনানিতে পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের বিষয়টি সামনে

এসে পড়ে, যদিও শরণার্থীদের দুরবস্থা এবং সেজন্য ত্রাণকার্যে ছিল এই শুনানির বিষয়বস্তু। আবার জুলাই মাসের ২২ তারিখে তিনি আরেকটি শুনানির ব্যবস্থা করেন। এই শুনানির বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ। এই বিষয়ে আমার একটি লেখাও এই শুনানিতে স্থান পায়। সিনেটর কেনেডি আরেকটি শুনানির আয়োজন করেন ৩০ সেপ্টেম্বর এবং সেই শুনানি শেষ হয় ৪ অক্টোবর। এবার শুনানিতে অনেক বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে দুজন অধ্যাপক জন লুই এবং অধ্যাপক জন কে সিনেটর ভারতবর্ষের শরণার্থী কেন্দ্র দেখতে পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া কেনেডি ভারত এবং পাকিস্তান ভ্রমণে যান আগস্ট মাসে। অবশ্য পাকিস্তান সরকার তাকে বাংলাদেশ দেখবার সুযোগ দেয়নি। ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন করে ২৬ আগস্ট তিনি একটি সংবাদ সম্মেলন করেন এবং দাবি করেন পাকিস্তানকে তার ধ্বংসযজ্ঞকে অবশ্য নিবৃত্ত করতে হবে।

১৯৭১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি সিনেটে বাংলাদেশে সহায়তা এবং ত্রাণ কাজের জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন। তাতে তিনি প্রস্তাব করেন যে বাংলাদেশের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার অনুদানের ব্যবস্থা করা হোক। পরবর্তীকালে নিক্সন সরকার ৪০০ মিলিয়ন ডলারের পরিবর্তে ২০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান প্রদান করে।

বাংলাদেশের জনগণের দুর্দশা তার মনে গভীর দাগ কাটে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের পর তিনি ১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তার কমিটির আরেকটি শুনানির ব্যবস্থা করেন। এই শুনানির বিষয় ছিল বাংলাদেশের পুনর্বাসন এবং ত্রাণ কার্যক্রম। একই সময়ে মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশের সমর্থক সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশকে কূটনীতিক স্বীকৃতিদানের জন্য একটি বিতর্কের ব্যবস্থা করেন। ১ ফেব্রুয়ারি এই বিতর্কে পাঁচজন সিনেটর অংশগ্রহণ করেন, তারা হলেন সিনেটর চার্চ, সিনেটর স্যাক্সবি, সিনেটর হলিং, সিনেটর এলট এবং সিনেটর কেনেডি।

আমরা সবাই জানি, ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি বাংলাদেশ পরিভ্রমণে আসেন। এখানে এসে যে জিনিসটি তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন তা ছিল বাংলাদেশের যুদ্ধে মার্কিন সরকার বিরোধিতা করলেও মার্কিন জনগণ এবং সংবাদ মাধ্যম বাংলাদেশের সঙ্গে ছিল।

জেনে রাখা ভালো যে সিনেটের কেনেডি যখন বাংলাদেশে আসেন তখনও মার্কিন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। সেই স্বীকৃতি আসে ৪ এপ্রিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সিনেটর কেনেডি শুধু আমাদের বন্ধু ছিলেন না বরং পরবর্তী সবসময় তিনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। আমি জানি ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুব দুঃখ পান যে গণতন্ত্রের জন্য যে রাষ্ট্রটি নয় মাস ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালিয়ে যায় সেখানে বারবার সেনাশাসন প্রতিষ্ঠা পায় এবং গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত হয়। ১৯৮৮-৯০ পর্যন্ত গণতন্ত্র উদ্ধারে যে সংগ্রাম বাংলাদেশে চলে সে-সময় তিনি আমাদের ব্যাপকভাবে সমর্থন করেন। এবং ২০০৬-০৮ পর্যন্ত যে দুঃসময় আমাদের দেশে বিরাজ করছিল সে-সময়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি সবসময় ছিলেন সোচ্চার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তার আগে থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধুকে ভালোভাবে চিনতেন এবং যখন ইয়াহিয়া জান্তা তার ক্যাঙ্গারু কোর্ট বসায় তখন তিনি ছিলেন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার। ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গবন্ধু আমেরিকা ভ্রমণকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তিনি বাড়িয়ে দেন তার সমর্থনের হাত। সেই সময় তাদের ভাবের আদান-প্রদান হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকেও তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আশির দশকে বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকতে তার সঙ্গে শুরু হয় সিনেটর কেনেডির পরিচয়। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে শেখ হাসিনার জীবনসংগ্রাম এবং কারাবাসে নিয়ে সিনেটর কেনেডি সবসময় নানাভাবে তার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। আমি তো শুধু বাংলাদেশ নিয়ে তার আগ্রহ এবং সহায়তার কথা বলে গেলাম। কিন্তু তার উদার বলয়ে নানা দেশের দুঃখী এবং নির্যাতনের লোকজন সবসময় আশ্রয় লাভ করে। ১৯৮৭ সালে যখন তার সিনেট জীবনের রজত জয়ন্তি বস্টন নাগরিকবৃন্দ তার জন্য গণসংসর্ধনার আয়োজন করে। তার মহাপ্রয়াণে আমেরিকা তার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারিয়েছে কিন্তু এইসঙ্গে পৃথিবীর নানা দেশের বঞ্চিত এবং নির্যাতিত লোকজন হারিয়েছে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধুকে।

দৈনিক জনকণ্ঠ : ২০ ভাদ্র, ১৪১৬

এডওয়ার্ড এম কেনেডি-জীবন্তিকা

ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর

গত ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় ওয়াশিংটনস্থ আরলিংটন জাতীয় সমাধিস্থলে আমি দাঁড়িয়েছিলাম কেনেডি ভ্রাতৃত্রয়ের অন্তিমশয়ানের অবস্থানে। আমার সঙ্গে ছিলেন সে দেশের সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিসের প্রেসিডেন্ট ড. নরমান কুরান্ড। প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে ৮ মিনিটের হাঁটা পথ দূরে একটি ছোট টিলার ওপরে নীরবে-নিথরে শুয়ে আছেন তিন কেনেডি, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক উদারদর্শন ও সংবেদনশীলতার তিন প্রবাদপুরুষ। জন কেনেডির অন্তিমশয়নস্থলে জ্বলছিল সেই অনির্বাণ নীল শিখা। তার সঙ্গে অন্তিমে শায়িত জ্যাকি কেনেডি, ১৯৫৬ সালে মৃত হয়ে জন্ম নেওয়া মেয়ে আরাবেলা, ১৯৬৩ সালে ২ দিনের জন্য জন্ম নেওয়া ছেলে পেট্রিক, তাদের দক্ষিণে রবার্ট কেনেডির শয়নফলক আর তারও দক্ষিণে কেনেডি সমাধিস্থলের টিলার ঢালুতে এডওয়ার্ড এম কেনডির শ্যামল ঘাসে মোড়া কবরে মাথায় সাদা রঙের ছোট একটি ক্রুস, সকালের রোদ ছড়ানো আকাশের পটে সৌম্য শুভ্রতার প্রতীক হয়ে হারানো স্মৃতির আবহ নিয়ে দাঁড়িয়ে।

এডওয়ার্ড কেনেডি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন ২৫ আগস্ট, ২০০৯-এ ৭৭ বছর বয়সে। মনে এলো প্রায় তিন যুগ আগে আগস্ট ১২, ১৯৮০-তে তিনি বলেছিলেন, তাদের জন্য, যাদের যত্ন আমাদের দায়িত্ব, কাজ চলছে নিরবধি, কারণ রয়ে গেছে অনেক কিছু করার, আশা এখনও বেঁচে আছে আর স্বপ্ন এখনও মিলিয়ে যাবে না। বাংলাদেশের স্বৈরশাসনের মানবতাবিরোধী নির্যাতনের স্মৃতিভার নিয়ে শ্রদ্ধাভরে দুই হাত তুলে মোনাজাত করেছি এডওয়ার্ড কেনেডির রুহের, আরলিংটনে শায়িত সকল কেনেডির আত্মার মাগফিরাত চেয়ে। সঙ্গী ড. নরম্যান কুরান্ড ইহুদি, তিনি তাদের আত্মার সদগতি চাইলেন তার ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী, দু'পাশে ও পেছনে দাঁড়ালেন জনা বিশেক খ্রিস্টান, সাদা, কালো, বাদামী, তেমনি প্রার্থনা করলেন তাদের স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী। অপলক নীল আকাশ তলে, সবুজে ছাওয়া পৃথিবীর এই মহাদেশের মানবতার শিখরপাড়ে সর্বজনীন শ্রদ্ধার নৈবেদ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা সকলে।

এডওয়ার্ড মুর কেনেডির মায়াভরা বিস্তৃত পরিচয় টেড কেনেডি বা টেডি নামে। তার জন্ম ১৯৩২-এর ২২ ফেব্রুয়ারি। জোসেফ ও রোজ কেনেডির শেষ সন্তান। পড়াশোনার বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীখ্যাত হার্ভার্ড। বন্ধুকে দিয়ে পরীক্ষা দেয়ার অপরাধে হার্ভার্ড তাকে প্রথম বছরই ২ বছরের জন্য বের করে দেয়। দুঃখজনক এই ঘটনা ঘটার পর বাবা জো কেনেডির মন্তব্য– ওসব কারচুপিতে যেও না, তুমি তো তত ধুরন্ধর নও। তখনকার দেশসেবার সূত্র ধরে যোগ দেন সেনাবাহিনীতে সাধারণ সেনা হিসেবে। বাবার অন্ধ স্নেহের প্রভাবে কোরিয়ার যুদ্ধে যেতে হয়নি তাকে, প্যারিসে ন্যাটো সংস্থার সম্মান, প্রহরী হিসেবে সেনাজীবনের শেষ। ফিরে আবার হার্ভাডে যোগদান। ফুটবল খেলায় অধিকতর মনোযোগসহ স্নাতক হয়ে বের হন ১৯৫৬-এ। সরকার, অর্থনীতি ও ইতিহাস ভালো লেগেছিল তার। অধ্যাপক জন গ্যালব্রেইথ অর্থনীতি বোঝার মান ও বৃত্ত বাড়িয়েছিলেন তার। তারপর ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ায় আইন শিক্ষা। সেখানে পরিচিত হন সুন্দরী ছাত্রী জোয়ান বেনেটের সঙ্গে। জোয়ান পিয়ানো বাজাতেন, ছিলেন আনন্দের ফুলঝুরি। বিয়ে হলো জোয়ানের সঙ্গে। তিন সন্তান, কন্যা কারা ও ছেলে এডওয়ার্ড ও পেট্রিকের বাবা হন। ত্রিশ বছর না পুরতে জন কেনেডি প্রেসিডেন্ট থাকতেই ম্যাসাচুয়েটস থেকে সিনেটর নির্বাচিত হন। তাড়াতাড়িই ঝুনো আইনপ্রণেতা হিসেবে নাম ছড়ায় তার। আমৃত্যু সিনেটর ছিলেন তিনি। ম্যাসাচুয়টসের ভোটাররা তাদের আস্থা সিনেটর কেনেডির ওপর ১৯৬২ থেকে কখনও হারাননি। ১৯৬৩-এর নভেম্বরে বড় ভাই পালা বদলের প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির খুনের খবর বাবা জোসেফকে পৌঁছাতে হয় তাকে। ১৯৬৪ সালে প্লেন দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ৬ মাস হাসপাতালে শুয়ে থেকে বই পড়তে হয় তাকে। স্ত্রী জোয়ানের ভাষায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ওর যা পড়া প্রয়োজন ছিল তাই তিনি পড়েছেন তখন। কেপকড ছাড়িয়ে সময় পেলেই অতলান্তিকের নীলিমায় নৌকার পাল তুলে বিশালতার উদারতায় মিশে যেতে চেয়েছেন তিনি। সিনেটের উদারপন্থী মানবতার সারথী হিসেবে প্রকাশ করতে থাকেন নিজেকে। ১৯৬৫-তে লিন্ডন জনসনের সময় অ-ইউরোপীয়দের যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হওয়ার পর প্রশস্ত করার আইনী কার্যকমে প্রোজ্জ্বল হয় তার ভূমিকা। ১৯৬৮-এর জুনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মেঝ ভাই রবার্ট কেনেডি খুন হলে পরিবারে প্রধানের দায়িত্ব পড়ে তার ওপর। কেনেডি পরিবারকে, বিপর্যয়ের মধ্যে বিশাল ভিন্নতার মধ্যে একতাসহ ধরে

রাখার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। বড় ভাই জন, মেঝ ভাই বব এবং সর্বোপরি বাবা জোসেফের স্বপ্নের বাহক হয়ে সিনেটের টেড কেনেডির ভাবমূর্তি মূর্ত হয় আরেক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে। তারপর ১৯৬৯-এর চাপপাকুইডিক। মার্থাস ভাইনইয়র্ডে ২৮ বছরের যুবতী মেরি জো, যিনি রবার্ট কেনেডির প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রচার অভিযানের নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন, তাকে নিয়ে রাতের আলো-আঁধারিতে কাঠের সেতু পার হওয়ার পথে গাড়িসহ পিছলে নিচে পড়লেন দুজন। কেনেডি বের হয়ে আসলেন, মেরি জো ডুবে মরলেন। মরা খালের কাদা ছড়ানো হলো দেশের সব এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল টেড কেনেডির প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা।

শাস্তি হয়েছিল তার দু'মাসের কারাদণ্ড, ভালো আচরণ সাপেক্ষে অনারোপণীয়। স্ত্রী জোয়ান বেনেটের সঙ্গে বিচ্ছেদ এলো। ছেলে এডওয়ার্ড ক্যান্সারে পা হারাল। কন্যা কারার শ্বাস রোগ। বড় ও মেজ ভাইয়ের অচিন্তনীয় খুন। মদ ও কর্মে অনিহায় বছর দুয়েকের শ্রান্তি কাটিয়ে টেড কেনেডি উঠে আসলেন সিনেটের সিংহরূপে। প্রচণ্ড পরিশ্রম, পারস্পরিক আলোচনা ও সকল সহযোগীর দিকে সমঝোতার হাত বাড়িয়ে সিনেটের সিংহ টেড জাতিকে প্রতিবন্ধীদের প্রতিরক্ষণ, সকলের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ, নারীর অধিকার বলবৎকরণ, শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো, শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য নিশ্চিত স্বাস্থ্যসেবা দেয়া, সর্বজনীন স্বাস্থ্যবীমাবিষয়ক সুনির্দিষ্ট আইন উপহার দিলেন; সংবেদনশীল গণতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে সমকালীন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ও পথ দেখানো ভূমিকা পালন করলেন। খ্যাতি পেলেন বিশাল নয়, সংবেদনশীল সরকারের প্রবক্তা হিসেবে। শক্তিহীন দরিদ্ররা বললেন– যদি কিছু করতে চাও, টেড কেনেডির কাছে যাও। টেড শক্তিহীন ও হীনকণ্ঠে সিংহ কণ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে উত্থাপিত প্রায় ২৫০০ বিলের সঙ্গে কেনেডি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এর মধ্যে ২০০-এর বেশি বিল আইনে পরিণত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রতিফলিত হলো তার ন্যায়নিষ্ঠ সংদেনশীলতা। টেড ১৯৭১ সালে নিক্সন কিসিঞ্জারের চণ্ড নীতির বাইরে এসে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সমর্থন করলেন। কলকাতা ও আগরতলায় উদ্বাস্তুদের অভাব, হাহাকার আর মুক্তির আর্তিতে মানবতায় এক হয়ে চোখ মুছলেন। রিগ্যানের রক্ষণশীলতার যুগে টেড উদারশীলতার প্রতিরক্ষণে সিংহ নিনাদে

লড়ে গেলেন। বায়াফ্রা, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রসারণে স্থবির রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন তিনি। সাম্প্রতিককালে ইরাকে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে গেছেন টেড।

টেড কেনেডির সবুজ ঘাসে ছাওয়া কবরের পশে যখন দাঁড়িয়ে তখন এসব মনে এলো ঘূর্ণায়মান ডিজিটাল এলবামে ভেসে আসা ছবির মতো। টেডের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা বস্টনে ১৯৭৫ সালের অক্টোবরের এক হিমেল সন্ধ্যায়। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তৃতীয় বিশ্বের এক ছাত্র হিসেবে গিয়েছিলাম তার কাছে, তার কথা শুনে, জন কেনেডির স্বপ্নকে মনে রেখে বসার ঘরে কপির পেয়ালায় আনমনে চুমুক দিতে দিতে বলতে চাইলেন ১৯৭২-এর চোখের জলে ভাসা আমাদের স্বাধীনতার আর্তি; জানতে চাইলেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কথা, বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যার কাহিনী, তারপরের স্বৈরশাসনের ইতিবৃত্ত। বললাম দুঃখের কথা, কলংকের কাহিনী, আঁকলাম স্বপ্নের রূপকল্প। বললেন, নিরাশ হয়ো না, তোমাদের কম্পাসের দিক যখন সাধারণ মানুষের কল্যাণ, জনগণের মুক্তির পথে স্থিরীকৃত, তখন একদিন-না-একদিন জয় আসবেই। এদেশেও এই মুক্তির পথে আমাদের অনেক বছর ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এখনও করছি। দরিদ্র দেশের দরিদ্র ছাত্র ধনী দেশের চিত্তের বিত্তে উজ্জ্বল এক নক্ষত্রের সখ্যতা পেল। ২০০২ সালে খালেদা জিয়ার জোট সরকার যখন প্রতিহিংসাবশত আমায় গ্রেফতার করে বিনা বিচারে অন্তরীণ করেছিল, তখন সেই পরিচিত আর সখ্যের সূত্র ধরে টেড কেনেডি প্রতিবাদ করেছিলেন, ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে আমার মুক্তির জন্য খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকারের কাছে দাবি করতে বলেছিলেন। তেমিন ২০০৭ সালে বেসামরিক লেবাসে আরোপিত স্বৈরশাসক কর্তৃক আমাকে গ্রেফতার করার পর পরই টেড কেনেডি প্রতিবাদ করেছিলেন, আইনের শাসনের সূত্র অনুযায়ী আমার মুক্তির দাবি সরবে উত্থাপন করেছিলেন। ১৯৭৫-এ তার সঙ্গে দেখা ও কথা বলার সময় টেডের ছিল মাথাভর্তি কালো চুল। ২০০৭-এ জেল থেকে বেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যেয়ে দেখেছি তার কালো ঝাঁকড়া চুল পরিণত বয়সের স্থিতিতে সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু জীবন যুদ্ধের মানবিক সংগ্রামের প্রচণ্ডতা, বলিষ্ঠতা ছেড়ে যায়নি তাকে। ২০০৮-এ ডেমোক্রেটদের জাতীয় সম্মেলনে, সেই প্রচণ্ড বলিষ্টতা নিয়ে বলেছেন, আমি এসেছি সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে

আমেরিকাকে বদলে দিতে, আমেরিকার ভবিষ্যৎ পুনস্থাপন করতে আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ অনুযায়ী মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আর বারাক ওবামাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে।

২০০৮-এর ২০ মে জানা গেল যে, টেড কেনেডি মস্তিস্কের ক্যান্সারে আক্রান্ত, শীঘ্রই মৃত্যু তাকে কেড়ে নেবে। এর আগে ৭ জানুয়ারি ওয়াশিংটনস্থ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে টেডি মিশ্র কালো সাধারণ আমেরিকানদের প্রতিভু বারাক ওবামার প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা সমর্থন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সময় এসেছে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের। কেপ কডের সীমানা ছাড়িয়ে দিগন্তবিহীন অতলান্তিকে পাল তুলে তার প্রিয় নৌকা 'ময়া'কে নিয়ে যে বিশালতার পটে পরিবর্তনের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন টেডি সারাজীবন, তাই মনে নিয়ে ডেমোক্রেটদের জাতীয় সম্মেলনে বলেছেন, আমাদের চারদিকে পরিবর্তনের নতুন ঢেউ, আমরা যদি এই সময়ে আমাদের কম্পাস সঠিকভাবে প্রযুক্ত করি, আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছবই, যে গন্তব্য কেবলমাত্র আমাদের দলের বিজয় নয়, বরং আমাদের জাতির নবায়ন। অপ্রাপ্তি, আশাহতের বেদনাবোধ এবং পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বের গুরুভার নিয়ে জীবনের এই কম্পাস সঠিকভাবে প্রযুক্ত করার নিরবধি সংগ্রামে রত ছিলেন টেডি। তার আত্মজীবনী ট্রু কম্পাসের পাতায় পাতায় সেই সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। ১৯৯১ থেকে তার ২য় স্ত্রী ভেক্টোরিয়া রেগী, সকলের কাছে বরণীয় ভিকি, তাকে সাহস আর প্রেরণা যুগিয়েছেন সঠিক কম্পাস ধরে। প্রথম স্ত্রী জোয়ানের প্রতি খানিকটা অভিমানেই টেডি বলেছেন, ভিকি হলেন সেই রমণী যিনি জীবন পাল্টিয়েছেন তার। তাদের দুজনের প্রিয় কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায়, সোনালি ডেফোডিলের দিগন্ত দোলানো সমাহারে হৃদয় ভরিয়েছেন তারা অনুভূতির আনন্দে, হাজারও ফুলের সুগন্ধী লীলার নৃত্য স্পন্দনে ভরিয়েছেন সারা মন। তার আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, তার উপলব্ধির কথা জীবন চিরন্তন, সংগ্রাম চলবেই। জীবন হলো পথ চলার আহ্বান, অন্যায় ও অনুচিতের প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ। টেড কেনেডি অভাবনীয় দুঃখ, অপ্রত্যাশিত অপ্রাপ্তি ও অনুদারীয় হত আশা সত্ত্বেও জীবনের এই পথে এগিয়ে গেছেন, সকলকে উদ্দীপিত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে এডওয়ার্ড বলেছেন, তার বাবা কোনো বিবেচনাতেই নিখুঁত ছিলেন না, কিন্তু তিনি কখনও আত্মসমর্থন করেননি, কখনও

অন্যায়কে ন্যায়ে রূপায়িত করার চেষ্টায় থেমে যাননি। কেপ কোডের ঢেউ ছড়ানো দিগন্তবিহীন সমুদ্রে পাল তোলা নৌকার প্রতিযোগিতায় তিনি সামনে যাওয়ার মন্ত্র দিয়েছিলেন ক্যান্সারের ছোবল খাওয়া ছেলেকে– আমরা জিতব, কেননা আমরা বেশি খাটব, বেশি তৈরি থাকব। ক্যান্সারজয়ী ছেলে বলেছেন, সেই থেকে বাবা হয়েছিলেন তার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

২০০৯-এর ২৫ আগস্ট তাঁর মৃত্যুর পরপরই তার পরিবার-পরিজনকে ই-মেইলে শ্রদ্ধাবনত সমবেদনা জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। তার উত্তরে কেনেডি পরিবার লিখেছে, টেডি আমাদের সকলের জীবন ছুঁয়ে গেছেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন আমাদের বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে দুর্বিপাক পেরিয়ে এগিয়ে যেতে এবং সর্বোপরি কোনোকালে কোনো সময়েই ঠিক করা পথ থেকে সরে না যেতে। ওয়াশিংটনের আর্লিংটন থেকে ফিরে এসে ক্যামব্রিজ শহরস্থ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, বিশ্বের জ্ঞান ও ধ্যানধারণা পরিবর্তনের পীঠস্থানে, চার্লস নদী থেকে বয়ে আসা কবোষ্ণ আবহে তাই গ্রহণ করলাম মনে-প্রাণে। যে হার্ভার্ড তাঁকে বের করে দিয়েছিল ১৯৫১-এর সেই মুক্ত চিন্তাপীঠ তার সংবেদনশীল আইনী জীবন ও সংগ্রামের স্বীকৃতি দিয়েছিল ২০০৮-এর ডিসেম্বরে তাঁকে বিশেষ সমাবর্তনে মননশীলতা ও সফলতার সম্মাননা প্রত্যয়নপত্র দিয়ে। এডওয়ার্ড মুর কেনেডি (১৯৩২-২০০৯) জয় হোক আপনার মানুষ হিসেবে স্ফুরণের, সাধনার, সঠিক কম্পাসের।

দৈনিক জনকণ্ঠ : ৬ নভেম্বর ২০০৯

তিনি কেন বাঙালিদের মনে চিরকাল বেঁচে থাকবেন?

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

পাঠক ভাইবোনদের আগেই জানিয়ে রাখি, এটা আমার নিয়মিত কলামের লেখা নয়, আমেরিকার থ্রি মাস্কেটিয়ার্স নামে পরিচিত কেনেডি ক্লানের শেষ মাস্কেটিয়ার্সের প্রতি এটা আমার শ্রদ্ধা নিবেদন। জন এফ কেনেডি, রবার্ট কেনেডি এবং এডওয়ার্ড কেনেডি তিন ভাই। সবার বড় আরও এক ভাই ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। বাকি ছিলেন তিন ভাই। জন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ডাল্লাস সফরের সময় আততায়ীর গুলিতে মারা যান। দ্বিতীয় ভাই রবার্ট কেনেডি প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্রেট দলের মনোনয়ন লাভের ক্যাম্পেইন চালানোর সময় ঘাতকের গুলিতে নিহত হন।

এই দুই ভাইয়ের বলতে গেলে তিন ভাইয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরে সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা এডওয়ার্ডের মৃত্যু হলো। তাও ব্রেন ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে। তারও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্র্যাট দলের মনোনয়ন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল। কিন্তু পরপর দুই ভাইয়ের মৃত্যু এবং নিজে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় (যে দুর্ঘটনায় তার গার্ল ফ্রেন্ড নামে পরিচিত এক মহিলা মারা যান) জড়িত হয়ে পত্রপত্রিকায় স্ক্যান্ডালের শিকার হওয়ায় হোয়াইট হাউসে ঢোকা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। অথচ ঢোকাটা তার জন্য ছিল প্রায় নিশ্চিত।

আজ সকালে (২৬ আগস্ট) ঘুম থেকে উঠে যখন শুনলাম এডওয়ার্ড কেনেডি মারা গেছেন, তখন একজন অতিপরিচিত আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা কেন মনে অনুভব করেছি তা প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝেছি, কেনেডির জন্য বাংলাদেশের বাঙালিমাত্রেরই মনে একটু নীরব ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। সেটা মূলত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকার জন্য। বাংলাদেশের সঙ্গে সলিডারিটি প্রকাশের জন্য তিনি সেই একাত্তর সালেই কাঁদাপানির মধ্যে দীর্ঘপথ হেঁটে শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সমর্থন নিক্সন-প্রশাসনের পক্ষে মার্কিন জনমত ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

এডওয়ার্ড কেনেডি সম্ভবত এ যুগে আমেরিকার সবচেয়ে জননন্দিত নেতা। মাত্র ৩০ বছর বয়সে সিনেটর নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত মার্কিন রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং এই রাজনীতির প্রগতিশীল ধারাটি নিয়ন্ত্রণে গভীর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলেন। তাকে বলা হয় আমেরিকার গ্রেট সিনেটর। তার আরেকটি বড় পরিচয় ছিল লিডার অব দ্য আমেরিকান লেফট (আমেরিকার বাম নেতা)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি যেমন সমর্থন জুগিয়েছেন, তেমনি পরবর্তীকালে আইরিশ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানেও বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ও আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির (আইআরএ) পলিটিক্যাল উইংয়ের নেতাদের এক টেবিলে বসিয়ে এক শতাব্দীকালেরও বেশি সময় রক্তাক্ত বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানে তিনি সফল মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমেরিকার সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতটির দিকেই ছিল তার সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য। আমৃত্যু তিনি এ স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করে গেছেন। আমেরিকান প্রশাসনের যুদ্ধবাদী অংশটির তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তিন যতটা সোচ্চার ছিলেন, তার সমকালীন আর কোনো মার্কিন হোয়াইট নেতা ততটা সোচ্চার ছিলেন কিংবা আছেন বলে আমার জানা নেই। কৃষ্ণাঙ্গ ওবামা যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট পার্টির নমিনেশন চান, তখন সবার আগে তাকে সমর্থন ও অনুমোদন দেন এওয়ার্ড কেনেডি। তিনি বর্ণ বিভেদের তাঁবুটি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও ওবামার ক্যাম্পেইনে যোগ দেন।

তার মৃত্যুসংবাদ শুনে আমেরিকারই এক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছেন, 'এডওয়ার্ড কেনেডি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ লিবারেল ডেমোক্র্যাট (A great liberal democrat)। একটু বামঘেঁষা হলে তাকে অনায়াসে একজন গ্রেট সোস্যালিস্ট বলা যেত।' এডওয়ার্ড কেনেডি নিজের সম্পর্কে বলতেন, 'I am a humanist (আমি একজন মানবতাবাদী)। আমার অন্য কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্ম মানবতাবাদ।'

কথাটা যে কতটা সত্য তা ১৯৭১ সালে তার সঙ্গে মাত্র দু'দিন ঘোরার সুযোগ পেয়ে উপলব্ধি করেছি। বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশের কয়েক লাখ শরণার্থী জড় হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ভরে গেছে। এত

শরণার্থী যে ঠাঁই দেয়ার যায়গা নেই। কোথাও কোথাও অগম্য স্থানে শরণার্থী শিবির। সেখানে কোনোক্রমে ভাঙা চালের নিচে নারী-শিশু নির্বিশেষে শরণার্থীরা মানবেতর জীবনযাপন করছে। এ ধরনের অন্যান্য শরণার্থী শিবির ও আশ্রয়কেন্দ্র ছিল কলকাতা শহরের অদূরে লবণ হ্রদ এলাকায়। কয়েক হাজার শরণার্থীর সেখানে বাস।

কলকাতার আজকের উপশহর সল্ট লেক (লবণ হ্রদ) দেখে কেউ অনুমান করতে পারবেন না, তখন লবণ হ্রদের কি অবস্থা ছিল। বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে জলাভূমি। রাস্তাঘাট নেই। শরণার্থী শিবিরগুলোতে পৌঁছতে হলে কাদামাটি ভেঙে, কখনও জলাভূমির এক হাঁটু পানি ভেঙে হাঁটতে হয়। তাতে আবার চিনেজোঁক কিলবিল করছে। এডওয়ার্ড কেনেডি কলকাতায় পৌঁছেই শরণার্থী শিবির দেখতে চাইলেন। সবচেয়ে কাছের শরণার্থী শিবির ছিল লবণ হ্রদে। তিনি সেখানেই যেতে সেদিনই প্রস্তুত।

তাকে জানানো হলো, লবণ হ্রদে যাওয়ার সমস্যার কথা। তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মুজিবনগর সরকারের লোকজনও ছিলেন। ছিলাম আমরা কয়েকজন সাংবাদিক। আমিনুল হক বাদশাও ছিলেন। সব কথা শুনে এডওয়ার্ড কেনেডি বললেন, সেখানে যদি হাজার হাজার নারী-পুরুষ ও শিশু বসবাস করতে পারে, তাহলে আমি যেতে পারব না কেন? সুতরাং তাকে লবণ হ্রদে শরণার্থী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হলো।

কিন্তু গাড়িগুলো যতদূর পর্যন্ত যেতে পারে, ততদূর পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। সামনে জলাভূমি। তা পেরিয়ে উঁচু টিলার মতো জায়গায় শরণার্থী শিবিরে যাওয়া যায়। জলাভূমিতে চিনেজোঁক কিলবিল করছে। আমাদের না হয় চিনেজোঁকের কামড় খাওয়া ও রক্তশোষণের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু এডওয়ার্ড কেনেডির তো তা নেই। তিনি আমাদের সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করলেন। পাতলুন না গুটিয়ে শুধু হাঁটু পর্যন্ত রাবারের গামবুট পরে তিনি জলাভূমিতে নেমেছিলেন এবং মাইলের পর মাইল হেঁটে শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেছেন। নারী ও বুড়োদের মাথায় হাত বুলিয়েছেন। কাদামাখা শিশুদের বুকে তুলে নিয়েছেন।

কেনেডির সঙ্গে যে সাংবাদিক টিমে আমি ছিলাম, সেই টিমে আমিনুল হক বাদশা ছিলেন না। তিনি ছিলেন অন্য এক টিমে। পরে সাংবাদিক বন্ধু তোয়াব খানের কাছে গল্প শুনেছি, বাদশা সবসময় কেনেডির সঙ্গে লেগে

থাকতেন এবং তাকে স্যার স্যার বলে সম্বোধন করতেন। এটা নিয়ে তার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা বেশ কিছুদিন তাকে স্যার বাদশা ডেকে 'ঠাট্টা-তামাশা' করেছে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার পর পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে এক কারাগারে আটক রাখে। কোথায় তাঁকে আটক রাখা হয়েছে বহুদিন তা গোপন রাখা হয়েছিল। রাওয়ালপিন্ডির এক ফরাসি সাংবাদিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শেখ মুজিবকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে? তিনি ধৃষ্টতার সঙ্গে জবাব দেন, 'ফ্রান্সের কোনো এক কারাগারে কোনো ক্রিমিনালকে আটকে রাখা হয়েছে, তা কি ফরাসি প্রেসিডেন্ট জানেন?'

এডওয়ার্ড কেনেডি কলকাতায় বসে ইয়াহিয়ার এই মন্তব্য শুনে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আমি আপনাদের ইন্ডিয়ার হিস্ট্রি পড়েছি। আলেকজান্ডার দি গ্রেট এক ইন্ডিয়ান কিংকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি করেও তার প্রতি রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। আর শেখ মুজিব তো ইয়াহিয়ার কাছে পরাজিত যুদ্ধবন্দি নন। তিনি সে দেশের নির্বাচনজয়ী প্রধানমন্ত্রী। তাকে বন্দুকের জোরে আটকে রেখে অসম্মান করার কোনো অধিকার পাকিস্তানের সামরিক জান্তার নেই। তারা গোটা বিশ্বের অসম্মান ও ঘৃণা কুড়াচ্ছে।'

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর এডওয়ার্ড কেনেডি তাঁর শোকবাণীতে যা বলেছিলেন, তা ছিল ক্ষোভ ও শোকমিশ্রিত এক অপূর্ব শোকগাথা। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডে যে আঘাত পেয়েছিলাম, আরেকবার সে আঘাত পেলাম।'

আমি একবার ওয়াশিংটনে বেড়াতে গিয়ে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলাম, তিনি আমাকে চিনতে পেরে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আধা ঘণ্টার মতো তার সান্নিধ্য থেকে যখন বিদায় নিতে যাই, তখন তিনি বলে উঠলেন, 'শেখ মুজিব ইজ ডেড, লং লিভ শেখ মুজিব।' এর বেশ কয়েক বছর পর আজ ২৬ আগস্ট সকালে (লন্ডন সময়) যখন তার মৃত্যুর খবর পেয়েছি, 'এডওয়ার্ড কেনেডি ইজ ডেড, লং লিভ এডওয়ার্ড কেনেডি।'

দৈনিক যুগান্তর : ২৬ আগস্ট ২০০৯

মানবতাবাদী এডওয়ার্ড কেনেডি

জগলুল আহমেদ চৌধুরী

মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডি জটিল রোগ ক্যান্সারের সঙ্গে সংগ্রাম করে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘসময় ধরে সিনেটর হয়ে তিনি যেমন একদিকে অনন্য সাধারণ অধ্যায় রচনা করেছেন, অন্যদিকে সেই দেশের সবচেয়ে খ্যাতনামা রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হিসেবে পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমুন্নত রেখেছেন। একজন মানবতাবাদী রাজনীতিবিদ হিসেবে আমৃত্যু লড়েছেন স্বাস্থ্য, উদ্বাস্তু এবং দারিদ্র্যসংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে। আমাদের বাংলাদেশে অত্যন্ত সঙ্গত কারণে এডওয়ার্ড বা সংক্ষেপে 'টেড' কেনেডি অত্যন্ত পরিচিত নাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের (পার্লামেন্ট) উচ্চ কক্ষ সিনেটরে ১০০ জন সদস্য থাকে। কয়েক বছর পর পর নতুন নির্বাচনের মাঝ দিয়ে সিনেটরদের পরিবর্তন হয় এবং অনেকে পুনর্নির্বাচিত হতে থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষিত শ্রেণী-অন্যদের কথা বাদই দিলাম–কতজন আমেরিকান সিনেটরের নাম জানেন কিংবা মনে রাখে। কিন্তু টেড কেনেডি এর ব্যতিক্রম। গত প্রায় চার দশক ধরে তার নাম এই দেশে পরিচিত এবং এই নামটি আমাদের মাঝে ভালোবাসা, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার সঞ্চারণ ঘটায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বাংলাদেশ থেকে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া ভারতে লাখ লাখ উদ্বাস্তুর শিবিরগুলো ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাদের সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা তাঁকে দারুণভাবে তাড়িত করেছিল। ফিরে গিয়ে মার্কিন সিনেটে এবং গণমাধ্যমে তিনি দাবি জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের সামরিকবাহিনীর সেই গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধ এবং একই সঙ্গে পাকিস্তানকে সব আমেরিকান সাহায্য স্থগিত করার জন্য। অবশ্য প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের প্রশাসন ইসলামাবাদের পক্ষেই শক্ত অবস্থান নিয়েছিল। তাতে বাংলাদেশের বিজয়ের পথযাত্রা থেমে থাকেনি এবং অনিবার্যভাবেই এগিয়েছিল চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে। সেই গৌরবোজ্জ্বল জয়ের কিছু দিনের মধ্যেই স্বাধীন ও মুক্ত বাংলাদেশে ছুটে এসেছিলেন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। আমাদের আনন্দ ও উল্লাসের পরশ তাঁকেও

স্পর্শ করেছিল অনাবিল হৃদয়ানুভূতির গভীরতা দিয়ে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে রোপণ করেছিলেন একটি বৃক্ষ– এই দেশের সমৃদ্ধি চেয়ে, এই হলেন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি।

কেনেডিদের পরিবারের রাজনীতি এবং জনসেবার ইতিহাস বিশ্বে দুর্লভ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাবা এবং ছেলে (জর্জ-বুশ) উভয়ই প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। আবার স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই রাজনীতিতে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন। বিল ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এবং স্ত্রী হিলারি প্রথমে সিনেটর এবং বর্তমানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত সে দেশে রয়েছে। কিন্তু কেনেডি পরিবারের খ্যাতি ও ঐতিহ্য ভিন্নতর। এক ভাই জন এফ কেনেডি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এবং আরেক ভাই রবার্ট কেনেডি এটর্নি জেনারেল হয়ে পরে প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সবচেয়ে ছোট ভাই নিরবচ্ছিন্নভাবে ৪৭ বছর ধরে সিনেটরের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তবে, এই পরিবারের সঙ্গে দুঃখজনকভাবে সাফল্যের পাশাপাশি দুঃখ ও বেদনা যেন ছিল নিত্যসঙ্গী। প্রেসিডেন্ট অবস্থায় জন কেনেডি ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে আততায়ীর গুলিতে ডালাসে মারা যান। পরবর্তী সময়ে একজন শক্ত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ১৯৬৮ সালে একইভাবে আততায়ীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন রবার্ট কেনেডি। এর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৈমানিক হয়ে মারা যান সবচেয়ে বড় ভাই। অস্বাভাবিক মৃত্যু এই পরিবারের বারবারই বিষাদের কারণ ঘটিয়েছে। এই ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক পরিবারটির যেন মিল রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিবারগুলোর সঙ্গে। তাদের বাবা জোসেফ কেনেডি প্রেসিডেন্ট ফ্রাংক্লিন রুজবেল্টের সময়ে লন্ডনে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ছেলেরা যেন রাজনীতিতে আমেরিকায় অগ্রগামী হয় এবং অবিশ্বাস্যভাবে সেটাই হয়েছিল। কিন্তু অকাল ও অস্বাভাবিক মৃত্যু তাঁদের জীবনে পূর্ণতা এনে দেয়নি। প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির ছেলেরও মৃত্যু ঘটেছে বিমান দুর্ঘটনায় মাত্র কয়েক বছর আগে। বলা যায়, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডিরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ৭৭ বছর বয়সে মস্তিষ্কে ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাভূত হন টেড কেনেডি।

প্রশ্ন উঠতে পারে যিনি এত দীর্ঘ সময় সিনেটর ছিলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট হতে পারলেন না কেন? এখানেও দুর্ঘটনা তাকে তাড়িত

করেছে। ১৯৮০ সালে টেড কেনেডি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের জন্য উৎসাহী হন। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট একই দলের জিমি কাটার ইরানে কূটনৈতিক ও অন্যান্য কারণে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। প্রার্থিতার দৌড়ে তাই কেনেডিই এগিয়ে ছিলেন কার্টারের চেয়ে। কিন্তু একটি সড়ক দুর্ঘটনায় কেনেডি আহত হন। কিন্তু তার সঙ্গী এক মহিলা নিহত হন যখন তাদের গাড়িটি রাস্তার পাশে পানিতে পড়ে যায়। কেনেডি সাঁতরিয়ে বেঁচে গেলেও তিনি দুর্ঘটনার খবর পুলিশকে জানান অনেক দেরিতে। এ ঘটনায় তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এবং দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কার্টারই জয়ী হয়ে যান। সবসময়ই একজন অত্যন্ত সক্রিয় সিনেটর হয়েই বিরাজ করেছেন এবং বরাবর ম্যাসাচুসেটস অঙ্গ রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। আমেরিকায় কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সিনেটের সদস্যরাও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী হিসেবে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ বারাক ওবামাকে সমর্থন করেন। অনেকেই মনে করেন হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে তার এই সমর্থন ওবামার জয়ের জন্য অত্যন্ত অবদান রেখেছিল। পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও স্বাভাবিকভাবেই তিনি দলীয় প্রার্থী ওবামার প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বের মানবতার ডাকে তিনি বিভিন্ন দেশে ছুটে গিয়েছেন। মৃত্যুর আগে স্বীয় দেশ আমেরিকায় স্বাস্থ্যখাতে কী করে আরও উন্নত সেবা দেয়া যায় এবং এই লক্ষ্যে নতুন পন্থা বের করা যায়– তা নিয়ে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ওবামা সিনেটর কেনেডির উৎসাহেই মূলত স্বাস্থ্যখাত নিয়ে বড় ধরনের কঠিন পরিকল্পনায় হাত দিয়েছেন।

এডওয়ার্ড কেনেডির মৃত্যুর সঙ্গে যবনিকা পড়ল এক বর্ণাঢ্য রাজনীতিবিদ ও মানবতাবাদীর, যিনি কয়েক দশক ধরে সদর্পে রাজনীতি ও প্রশাসনে বিচরণ করেছেন। আমরা তার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞ এই কারণে তার মতো ব্যক্তিত্বের সমর্থন ও সহায়তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সার্থক করেছে।

দৈনিক যুগান্তর : ৩১ আগস্ট ২০০৯

এক ব্যতিক্রমী আমেরিকানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

হারুন হাবীব

বলতেই হবে, ভিন্ন এক আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করতেন এডওয়ার্ড এম কেনেডি। এমন এক আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করতেন, যে আমেরিকাকে একবাক্যে সম্মান-শ্রদ্ধা করা যায়, ভালোবাসা যায়। কাজেই এ মানুষটির মৃত্যু শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়, পৃথিবীর তাবত মানবতাবাদীর জন্যই শোক সংবাদ। বলতেই হবে, টেড কেনেডি বা এডওয়ার্ড কেনেডির মৃত্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন এক নাগরিক হারালো, যিনি বিশ্বের মহাশক্তিধর দেশটিকে মর্যাদাশীল করেছিলেন।

মনে পড়েছে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সেদিনের অপেক্ষাকৃত তরুণ সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির দুঃসাহসী মানবতাবাদী ভূমিকার কথা। পাকিস্তান হানাদার সৈন্য ও তাদের দেশীয় অনুচরেরা সর্বাত্মকভাবে গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছে। হত্যা আর নির্বিচার নির্যাতন করেই ওরা বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলন স্তব্ধ করতে মনস্থ করেছে। যত্রতত্র বাঙালি হত্যা করে চলেছে তারা সেদিনকার পূর্ববঙ্গের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। ফলে জীবন বাঁচাতে বন্যার মতো মানুষ ছুটে যাচ্ছে ভারত সীমান্তের দিকে। তারা গণহত্যা থেকে বাঁচতে চায়। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের প্রশাসন এই গণহত্যাকে আমলে নিচ্ছে না। এমনকি গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে পাঠানো ঢাকার মার্কিন কনস্যুলেটের প্রধান আর্চার কে ব্লাডের জরুরি তারবার্তাটিকেও আমলে নেননি প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। এত নির্মমতা দেখার পরও ওয়াশিংটন একবিন্দু সরে আসছে না পাকিস্তানের পক্ষ থেকে। তারা সরাসরি বাংলাদেশের গণমানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। পাকিস্তানে নতুন করে অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা নিচ্ছে।

ঠিক সে-সময়ে ভিন্ন এক আমেরিকার ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন শরণার্থী বিষয়ক মার্কিন সিনেট সাব-কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডি। তিনি ছুটে এলেন ভারত সীমান্তে। কলকাতা ও আগরতলায় ব্যক্তিগতভাবে ঘুরে দেখলেন একের পর এক শরণার্থী শিবির। লাখ লাখ মানুষের দুর্গতি, আহাজারি দেখলেন। কলকাতায় কেনেডি আসার

খবরগুলো দৈনিক যুগান্তর ও আনন্দবাজারের পাতায় পড়লাম। এরপর কেনেডি চলে গেলেন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। ছোট্ট শহর আগরতলা তখন লোকে লোকারণ্য। ত্রিপুরার তখনকার জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশি বাংলাদেশী শরণার্থী জায়গা করে নিয়েছে সীমান্তঘেঁষা ছোট্ট ভারতীয় রাজ্যটিতে। কোথাও কোনো ঠাঁই নেই। স্কুল, কলেজ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, পাহাড়পর্বত– সব জায়গায় বাংলাদেশের বিপন্ন মানুষ।

আমাদের নিজেদের যুদ্ধক্ষেত্র মেঘালয় সীমান্তের ১১ নম্বর সেক্টর। কিন্তু আমাকে অনেক সীমান্তেই ঘুরতে হয়। মুজিবনগর সরকারের রণাঙ্গন সংবাদদাতার নিয়োগ পাওয়ার পর থেকেই এ আমার বাড়তি কাজ। মনে পড়ে, আগস্টের ১২ তারিখে যেদিন সিনেটর কেনেডি আগরতলায় এসে নামলেন, সেদিন দেশত্যাগীদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর উন্মাদনা শুরু হলো। যে আমেরিকা পাকিস্তানি গণহত্যাকে সমর্থন দিচ্ছে, যে আমেরিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করছে, সেই শক্তিধর আমেরিকার একজন সাহসী নেতা নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে ভারত সীমান্তের শরণার্থী শিবিরগুলোতে সশরীরে চলে এসেছেন। ঘটনাটি খুব ছোট নয়। কাজেই সাধারণ মানুষের উৎসাহ উপচে পড়ছে।

আমার মনে পড়ে, বিমানবন্দর থেকে রাজনিবাসের দু'ধারে কেনেডিকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়েছিল সেদিন। জনতার ভিড়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী ও তাদের আশ্রয়দাতা ত্রিপুরাবাসী। হাজারো স্লোগান উঠেছিল– 'জয় বাংলা', 'এডওয়ার্ড কেনেডি জিন্দাবাদ', 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জিন্দাবাদ'। বিমানবন্দর থেকে জিবি হাসপাতাল, সেখান থেকে রাজনিবাস। এক এক করে ঘুরে দেখলেন কেনেডি বাংলাদেশের সীমান্তঘেঁষা শরণার্থীদের ক্যাম্প। সম্ভবত মোহনপুর ও গোকুলনগরসহ অনেক শরণার্থী শিবির দেখলেন তিনি সেদিন। তারপর এলেন আগরতলার সার্কিট হাউসে। কেনেডি নিজের চোখে দেখলেন, পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে, ধর্মের নামে নিরস্ত্র মানুষের ওপর কত নির্মম ও পাশবিক হতে পারে একটি দেশের প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী।

আরও মনে পড়ে, সেদিন বড় কিছু বক্তব্য রাখেননি এডওয়ার্ড কেনেডি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা নিয়ে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরে জর্জরিত হয়েছিলেন মার্কিন সিনেটর। সংক্ষিপ্ত উত্তরে বলেছিলেন,

মার্কিন সরকার যেন পাকিস্তানকে আর অস্ত্র সরবরাহ না করে, তার চেষ্টা তিনি করবেন। শরণার্থীদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার দিকে যেন আন্তর্জাতিক মহল নজর দেয়, সেদিকেও তিনি নজর দেবেন। এবং এটিও বলেছিলেন, পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেন মুক্ত হতে পারেন, সে চেষ্টাও তিনি চালাবেন সর্বাত্মকভাবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির এই সফরে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে বাংলাদেশী শরণার্থীর দুর্দশা সম্পর্কে সিনেটে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছিলেন তিনি। পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন। সেইসঙ্গে পূর্ববঙ্গে মানবিক ও রাজনৈতিক দুর্দশার জন্য সেদিনের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন দুষ্কর্মে সহযোগিতা করার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বলেও কড়া সমালোচনা করেছিলেন তিনি নিক্সন প্রশাসনের। এরপর এডওয়ার্ড কেনেডি শরণার্থীদের প্রতি বিশ্বের মনোযোগ আকৃষ্ট করার এবং তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করারও চেষ্টা করেন। এতে পাকিস্তানি গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসনের 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' একদিকে সুবিশাল ভূমিকা রেখে চলছিল বাংলাদেশের পক্ষে; অন্যদিকে বিশ্ব-জনমত গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল এডওয়ার্ড কেনেডির দৃঢ়চিত্ত মানবতাবাদী অবস্থান।

আমার বিশ্বাস, আমাদের মূলধারার পত্রপত্রিকা এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো যথার্থভাবেই এডওয়ার্ড কেনেডিকে আখ্যায়িত করেছে তার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর। বেশিরভাগই সদ্যপ্রয়াত এই মহৎপ্রাণ আমেরিকানকে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু বলে সম্বোধন করেছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সর্বাত্মক সমর্থনের কথা উল্লেখ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি খ্যাতিমান পরিবারের সদস্য টেড কেনেডি গণতান্ত্রিক ও সহনশীল আমেরিকার প্রতিভু। তার এক ভাই প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে হত্যা করা হয়। আরেক ভাই সিনেটর রবার্ট কেনেডি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রচারণা চালানোর সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। আরেক ভাই মারা যান যুদ্ধে। সর্বশেষ ছিলেন এডওয়ার্ড কেনেডি। ৭৭ বছর বয়সে তিনিও চলে গেলেন পরপারে। সারাটি জীবন তিনি প্রবল

সাহসী মানবতাবাদী ভূমিকা রেখেছেন। তার সেই ভূমিকা বারবার আমেরিকার প্রশাসনের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের স্বতন্ত্র আত্মবিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন। ১৯৬৩ এবং ১৯৬৮ সালে দুই ভাই আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর এক অর্থে তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির ধারক-বাহক হন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রবল সমালোচনা করেন এডওয়ার্ড কেনেডি। বুশ প্রশাসন যখন নিছক শক্তির দম্ভে ইরাক দখল করে নেয়, তখনও জর্জ বুশের কট্টর সমালোচক ছিলেন তিনি।

চার যুগ আগের কথা। আমরা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নয় মাসের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের পর সর্বপ্রথম যে বিদেশি সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ সফরে আসেন, তিনি সদ্যপ্রয়াত এডওয়ার্ড কেনেডি। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। সদ্যস্বাধীন দেশের মাটিতে পৌঁছে তিনি ছাত্র-জনতার এক শোভাযাত্রায় অংশ নেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। শুধু তা-ই নয়, হানাদার পাকিস্তানিবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ঐতিহ্যবাহী বটগাছটি সমূলে উৎখাত করে ঐতিহাসিক বটতলাকে বিরাণ করেছিল, বাঙালি তারুণ্যের বিদ্রোহের আশ্রয়কে উৎপাটিত করেছিল, ঠিক একই জায়গায় এবং একই বটবৃক্ষের একটি চারা পুঁতে নতুন ইতিহাসের যাত্রা শুরু করেছিলেন সিনেটর কেনেডি। সেদিনের অনুষ্ঠানে আমরা অনেকেই উপস্থিত ছিলাম। মনে পড়ে, ডাকসুর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক হয়ে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর করতালির মধ্য দিয়ে গণআন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী বটবৃক্ষের নতুন সংস্করণের পত্তন করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর কেনেডি। আজ যে বটগাছটি আবারও সুবিশাল মহীরুহ হয়েছে, পাকিস্তানি সেনাপতি শাসকদের ধ্বংসকাণ্ডের ওপর ছায়াবিস্তার করা নতুন যে বটবৃক্ষ জন্ম নিয়েছে, সে বৃক্ষের চারাগাছ লাগিয়েছিলেন বাংলাদেশবান্ধব এডওয়ার্ড কেনেডি।

প্রবল এই মানবতাবাদী বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রেখেছিলেন। ২০০৭-'০৮ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দ্রুত নির্বাচন দিয়ে দেশকে গণতন্ত্রে ফিরিয়ে নিতে আবেদন করেছিলেন কেনেডি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর সেনা-নির্যাতনের শক্ত প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। এই মহাপ্রাণকে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক হিসেবে আমার শ্রদ্ধা।

পরিশেষে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভিনদেশি যেসব মহাপ্রাণ প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিশেষ অবদান রেখেছিলেন, ইতিহাসের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধের কারণেই তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মানিত করা উচিত। তাদের মধ্যে একজন ফ্রান্সের বিশ্বনন্দিত দার্শনিক আন্দ্রে মালরো, যিনি বৃদ্ধ বয়সেও ভারত সীমান্তে এসেছিলেন অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করতে। আরও আছেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, যাঁর ব্যক্তিগত সমর্থন ও নিরলস প্রচেষ্টা না থাকলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস কোনদিকে গড়াত বলা যায় না। আছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, আছেন ভারতের সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, ত্রিপুরার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ, আছেন ডব্লিউএএস ওডারল্যান্ড, ঢাকায় বাটা সু কোম্পানির ভিনদেশি সেই কর্মকর্তা, যিনি অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এরপরও আছেন জর্জ হ্যারিসন ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর, যাঁরা পশ্চিমা বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে প্রবল জনমত গড়ে তুলেছিলেন। আমরা যে আত্মবিস্মৃত জাতি নই, তার প্রমাণ রাখতে তাদের দ্রুত সম্মানিত করা জরুরি। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ চার যুগ অতিক্রম করছে।

দৈনিক সমকাল : ৩১ আগস্ট, ২০০৯

এডওয়ার্ড কেনেডি ও ঐতিহাসিক বটতলা

আসিফ আহমদ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রবল রোষ পড়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দুটি স্থাপনার ওপর– কলাভবনের বটতলা এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। বটতলায় ছাত্রছাত্রীরা জমায়েত হয় এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শপথ নেয়। তাদের লক্ষ্য, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি ভেঙে ফেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। তাই ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের চিরতরে দমিয়ে রাখার জন্য ঢাকায় গণহত্যা অভিযান শুরুর পরপরই তারা এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। শহীদ মিনার গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে 'মসজিদ' লিখে রাখা হয়। আর বটতলার বটগাছের ডালপালার কোনো কিছুর চিহ্নই তারা রাখেনি। কোথায় তা ফেলে দেয়া হয়েছিল, কে জানে?

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ঢাকায় এসেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সংবর্ধনা দিয়েছিলেন ডাকসু। বটতলায় ছিল না বটগাছ। কিন্তু শিক্ষার্থীদের আবেগের বহিঃপ্রকাশে কোনো সমস্যা ছিল না। কলাভবন প্রাঙ্গণ ও এর আশপাশ ছাত্রছাত্রীদের সমাগমে ভরে গিয়েছিল। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকেও তারা এসেছিল দলে দলে। এডওয়ার্ড কেনেডি তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিক্সন প্রশাসনের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেন। হেনরি কিসিঞ্জরের ভূমিকার নিন্দা করেন। তিনি অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্যও দাবি জানান। তার ভাষণের পর একটি ঐতিহাসিক কীর্তি সমাপনের জন্য তাঁর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। এর প্রস্তুতি আগে থেকেই ছিল। যে বটগাছটি যে স্থান থেকে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী উপড়ে ফেলেছিল, সেখানে আরেকটি বটের চারা রোপনের জন্য তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন সানন্দচিত্তে। তাকে নিশ্চয়ই এ বটগাছের ইতিহাস বলা হয়েছিল। ভিনদেশি এ মহানুভব ব্যক্তিটি একটি গাছের ওপর কোনো সামরিক কর্তৃপক্ষের এত রাগ সেটা কতটা বুঝেছিলেন সেটা জানার উপায় নেই। তবে এটা নিশ্চিত যে, বিষয়টি যে বিরল সেটা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির লাগানো বটের চারাটি ফের মহীরুহ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার্থীদের দিচ্ছে ছায়া। সবচেয়ে বড় কথা প্রায় চার দশক পরও তা রয়ে গেছে মুক্ত এবং স্বাধীন মত ও পথের অনুসারীদের জন্য অশেষ ভরসাস্থল। এখানে তারা আসতে পারে নির্ভয়ে। তারা অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথানত না করার শপথ নেয়। বটের ছায়া তো বদলে যায় না। বটতলার কাছেই নির্মিত হয়েছে অপরাজেয় বাংলা। এখন সেখানেই প্রতিবাদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ কারণে বটতলার মহিমা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি।

এডওয়ার্ড কেনেডিও যে বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের জন্য ছিলেন বটের ছায়া। একাত্তরে তিনি আমাদের পক্ষ নিয়েছিলেন জোরালোভাবে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযানকে তিনি ধিক্কার জানান এবং তা বন্ধের জন্য ক্রমাগত আরও বেশি সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকেন। নিক্সন প্রশাসনের তিনি নিন্দা জানান এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে বলেন। তিনি ভারতে বাংলাদেশের যেসব শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পাশে দাঁড়ান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তিনি একের পর এক শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে অভয় দিচ্ছেন, এমন ছবি ও খবর বিশ্বব্যাপী প্রচার হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিও তিনি সমর্থন ব্যক্ত করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের কাছে দেওয়া প্রতিবেদনে লিখেছেন : ১৯৭১ সালের ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৯৫ লাখ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। প্রতিদিন গড়ে এসেছে ১০ হাজার ৬৪৫ জন।

সিনেটর কেনেডি বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন নিপীড়িতদের পক্ষে। একাত্তরের মতোই তিনি ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের ওপর সামরিকবাহিনীর নির্যাতনের নিন্দা করেন। তিনি ২৬ অক্টোবর (২০০৭) আগস্ট আন্দোলনে আটক ১২ জন শিক্ষকের মুক্তি চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবিরের কাছে একটি চিঠি হস্তান্তর করেন এবং তাকে তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের কাছে হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ জানান। চিঠিতে তিনি লেখেন,

শিক্ষকদের ওপর নির্যাতন পরিচালনা করা হয়েছে এমন অভিযোগ পেয়ে আমি বিশেষভাবে ব্যথিত। কোনো অভিযোগ ব্যতিরেকে কেবল রাজনৈতিক কারণে তাদের আটক রাখা আপনার দেশের একাডেমিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রতি আঘাতস্বরূপ।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশের জনগণের পাশে ছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে তাঁর রয়েছে বিপুল অবদান। ১৯৭২ সালে ছাত্রসমাজ তাঁকে সম্মানিত করেছিল উপড়ে ফেলা বটগাছ ফের রোপণ করার অনন্য সুযোগ প্রদান করে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সে-সময়ে সরকারের অবস্থানের বিরোধিতা করেন এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কঠিন সংগ্রামে যারা লিপ্ত ছিলেন তাদের বন্ধু হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার কি তাকে যোগ্য সম্মান দিয়েছে? তিনি তার কাজ করেছেন কিন্তু আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি।

একই কথা বলা যায়, পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসন সম্পর্কে। তাঁরা বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কনসার্ট আয়োজন করেছিলেন। এর লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি। তারা সফল হয়েছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ হানাদারদের পরাস্ত করার লড়াইয়ে পেয়েছিল প্রেরণা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ কি এসব মহান হৃদয়বান মানুষের জন্য যা যা করা কর্তব্য ছিল সেটা পালন করেছে? তাদের মতো আরও অনেক মনীষী ওই সময়ে অনন্য অবদান রেখেছিল। তাদের প্রতি নিশ্চয় আমাদের দায়িত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশের অকৃত্রিম সুহৃদ ও দরদি বন্ধু সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির প্রয়াণে জানাই শ্রদ্ধার্ঘ্য।

দৈনিক সমকাল : ২৭ আগস্ট, ২০০৯

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

আক্কু চৌধুরী

একজন মহান ব্যক্তিকে স্মরণ করার উদ্দেশে এখানে আমরা সমবেত হয়েছি, তিনি সর্বাধিক কঠিন সময়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মানুষের ওপর যখন হত্যা ও ধর্ষণের মতো বর্বরতা চালানো হয়েছিল, দলে দলে বাঙালি শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছিল তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। নিক্সন-কিসিঞ্জার প্রশাসনের বিপরীতে ম্যাসাচুয়েটসের ৩৭ বছর বয়সী তরুণ সিনেটরের সেই ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্ববহ। বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার পক্ষে নিক্সন-কিসিঞ্জার কট্টর নীতি গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে নৃশংসতা চালিয়েছে তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন তাকে অন্ধভাবে সমর্থন দিয়েছিল। কয়েকজন সিনেটর এবং কংগ্রেসম্যানকে সঙ্গে নিয়ে সিনেটর কেনেডি তখন পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে বিশেষ করে মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কূটনৈতিক আর্চার ব্লাডের কথা বলা যেতে পারে। তিনি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টকে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা অবহিত করেন এবং এ নিয়ে কথা বলার অনুরোধ জানান।

টেড এডওয়ার্ড কেনেডি সিনেটে কেবল বক্তৃতা দিয়েই থেমে ছিলেন না, তিনি ভারতে এসে ১ কোটি শরণার্থীর দুর্দশাও দেখেছেন। কাছ থেকে শরণার্থীদের ব্যথা-বেদনা উপলব্ধি করার জন্যই তিনি ভারত সফর করেন। ফিরে গিয়ে তিনি জুডিশিয়াল কমিটির কাছে শরণার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। বাংলাদেশের ঘটনাকে তিনি 'আধুনিক কালের অন্যতম মর্মান্তিক দুর্দশা' বলে উল্লেখ করেন।

নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছিল। তবে কেনেডি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর গণহত্যার চিত্র আমেরিকানদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। এর ফলে সে বছর ইউএস কংগ্রেস পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রির নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে একটি বিল পাস করে।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর যৌথবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটে।

১৯৭২ সালে ভ্যালেইনটাইন্স দিবসে টেড কেনেডি তার স্ত্রী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। 'জয় বাংলা, জয় কেনেডি' স্লোগানে তাঁকে বীরোচিত সংবর্ধনা দেয়া হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। '৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে এখান থেকেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করে। সেখানে তিনি একটি বটচারা রোপণ করেন। কেনেডি যে স্থানে বটচারা রোপণ করেন সেখানে মুক্তিযুদ্ধের আগে একটি বটগাছ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বটগাছকে ঘিরে বহু আন্দোলন-সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। কালক্রমে গাছটি বাঙালির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীকে পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বটগাছটি উপড়ে ফেলে। তারা ভেবেছিল এর মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহাকে নস্যাৎ করা যাবে। কেনেডির রোপিত চারা সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে টিকে থাকা একটি দেশের স্মারক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসা এক মহান ব্যক্তির স্মারকও এই গাছ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ হাজারের বেশি ছাত্রের সামনে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের সমান বলে মন্তব্য করেন। তিনি এও বলেন, মার্কিন সরকার আপনাদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি না দিলেও বিশ্ববাসী স্বীকৃতি দিয়েছে।

'৭২-এর ৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাস্তবতা তারা মেনে নেয়। এডওয়ার্ড কেনেডির দৃঢ় উদ্যোগের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

এডওয়ার্ড কেনেডি কেবল নিজ দেশেই নয়, সারাবিশ্বের দলিত মানুষের কণ্ঠস্বরে পরিণত হন। এ-কারণেই বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সব রাষ্ট্র 'সিনেটের সিংহ' খ্যাত এই মহান ব্যক্তিকে স্মরণ করছে।

কেনেডি একবার বলেছিলেন, আমরা জানি কেবল ভবিষ্যৎই টিকে থাকবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, যে ভবিষ্যৎ আমরা নির্মাণ করব সে ভবিষ্যতে আমরাও বেঁচে থাকব। আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী। এডওয়ার্ড কেনেডি চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

১৯৬৮ সালের ৮ জুন তাঁর দেয়া এক বক্তৃতা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। আততায়ীর হাতে নিহত তাঁর ভাই রবার্ট কেনেডির স্মরণে নিউইয়র্কের সেন্ট প্যাট্রিক গির্জায় তিনি এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার ভাই জীবিত অবস্থায় যেমন ছিলেন মৃত্যুর পর এর বাইরে তাঁকে বড়-এর মহৎ করে দেখানোর প্রয়োজন নেই। সাধারণভাবেই তাঁকে ভালো ও সজ্জন লোক বলা যায়। তিনি ভুল-ক্রটি দেখতে পেতেন এবং শোধরানোর চেষ্টা করতেন। তিনি দুঃখ-দুর্দশা দেখতে পেতেন এবং তা লাঘবের চেষ্টা করতেন। তিনি যুদ্ধ দেখতেন এবং তা বন্ধ করার চেষ্টা করতেন।

যারা তাঁকে ভালোবাসেন এবং যারা তাঁকে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে এসেছেন তারা শুধু এই বলে প্রার্থনা করবেন, আমাদের কাছে তিনি যেমন ছিলেন এবং অন্যদের জন্য যা কামনা করেছেন একদিন সারাপৃথিবীর কাছে তা ধরা দেবে।

আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সময়ে তিনি যাদের কাছে গিয়েছেন আর যারা তাঁর কাছে এসেছেন তাদের তিনি বলেছেন, “কিছু মানুষ বস্তুগুলোকে যেমন আছে তেমনভাবেই দেখে এবং বর্ণনা করে। আমি সেসব কিছুর স্বপ্ন দেখি, যা কখনও ছিল না এবং কেন ছিল না তা বর্ণনা করি।’

এডওয়ার্ড কেনেডিও ভালো এবং সজ্জন। তিনি বস্তুগুলো যেমন তেমনই দেখতেন। ভুল-ক্রটি দেখতে পেতেন এবং তা শোধরানোর চেষ্টা করতেন। দুঃখ-দুর্দশা দেখতে পেতেন এবং তা লাঘবের চেষ্টা করতেন। যুদ্ধ দেখতে পেতেন এবং তা থামানোর চেষ্টা করতেন। সত্তর বছর আগে পৃথিবীতে আমরা জঘন্যতম যুদ্ধ দেখেছি। আসুন আমরা সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ সব যুদ্ধ বন্ধের শপথ নেই।

দৈনিক সংবাদ : ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধারক এডওয়ার্ড কেনেডি

অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম সরকার সাগর

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধারক-বাহক বাংলাদেশের পরম বন্ধু ৪৭ বছর সিনেটর থাকা এডওয়ার্ড কেনেডির জীবন কেড়ে নেয় প্রাণঘাতী ক্যান্সার। ব্রেন ক্যান্সারে তিনি গত ২৬ আগস্ট বুধবার মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। টেড কেনেডির রাজনৈতিক জীবন ছিল একদিকে যেমন বর্ণাঢ্য, অন্যদিকে তেমনি বহুমাত্রিক। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টিতে কেনেডি পরিবারের ৫০ বছরের অবসান ঘটল। যদিও এডওয়ার্ড কেনেডি আর আমাদের মাঝে নেই, তারপরও তার আদর্শ চিরকাল অধিকারহারা মানুষের প্রেরণার খোরাক হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এডওয়ার্ড কেনেডি অনন্য সাধারণ নাম। কেননা '৭১-এর মুক্তি সংগ্রামে রয়েছে তাঁর অনন্য অবদান। এডওয়ার্ড কেনেডি ১৯৬২ সাল থেকে টানা সাতবার সিনেটর নির্বাচিত হন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন। টেড কেনেডি নামে পরিচিত এ বর্ষীয়ান রাজনীতিক ছিলেন কেনেডি পরিবারের শেষ প্রজন্ম। ১৯৬২ সালে সিনেটর পদে নির্বাচিত হওয়ার পর একাদিক্রমে নয়বার তিনি ওই পদে বিজয়লাভের গৌরব অর্জন করে সিনেটের দ্বিতীয় বয়োজ্যেষ্ঠ সিনেটর হিসেবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রবাসীর সেবা করে গেছেন।

পারিবারিক পরিচিতি এডওয়ার্ড কেনেডির ভাই জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬৩ সালে ডালাসে আততায়ীর গুলিতে তিনি নিহত হন। অপর সহোদর রবার্ট কেনেডি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে শামিল থাকাকালে ১৯৬৮ সালে লস এঞ্জেলেসে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান। রবার্ট বব কেনেডি টেডের শুধু ভাই ছিলেন না, ছিলেন ঘনিষ্ঠতম সুহৃদও। তাই জন ও ববের অকাল ও দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু তার জীবনে গভীর রেখাপাত করে। যুক্তরাষ্ট্রের এক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এডওয়ার্ড কেনেডি, যিনি টেড কেনেডি নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন– বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, স্পষ্ট বক্তব্য এবং জনদরদী হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন সামান্য সময়ের মধ্যে।

মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই মহান প্রবক্তা ৭৭ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বিদায়ে বাংলাদেশ হারালো এক অকৃত্রিম সুহৃদকে। একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোর বিরোধিতার কঠিন সময়ে তিনি স্বেচ্ছায় এদেশের মুক্তিপাগল জনমানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। একাত্তরের বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে একাত্মতা প্রকাশের জন্য তিনি ছুটে এসেছিলেন মুজিবনগরে, কলকাতায়। শরণার্থী শিবিরগুলোতে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের বাস্তুহারা মানুষের দুর্দশা দেখেছেন, দেশে দেশে শরণার্থীদের জন্য সাহায্য চেয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

দ্য লায়ন অব সিনেট মার্কিন ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাই হিসেবে নন বরং নিজ গুণ, যোগ্যতা ও অবদানের কারণেই তিনি ছিলেন অনন্য। সিনেটে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি 'দ্য লায়ন অব সিনেট' বা 'সিনেটের সিংহ' নামে খ্যাত ছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারেই তাঁর ডেমোক্র্যোট রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৯৬২ সালে তার ভাই তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ছেড়ে দেয়া সিনেট আসন পূর্ণ করার বিশেষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তিনি। এ নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়েই টেড কেনেডির জীবনের রাজনৈতিক অধ্যায়ের শুরু। এরপর ১৯৬৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা আটবার তিনি পূর্ণ মেয়াদে সিনেটর নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে দীর্ঘকাল সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদও ডেমোক্র্যাট দলের মনোনয়ন নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল। কিন্তু পরপর দুই ভাইয়ের মৃত্যু এবং নিজে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়ার কারণে তার হোয়াইট হাউসে ঢোকার সম্ভাবনা চিরতরে বিলীন হয়ে যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : আমাদের দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে কজন বিদেশির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। এ মার্কিন রাজনীতিক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। প্রায় ৯ লাখ বাংলাদেশী শরণার্থীর দুর্দশা সম্পর্কে তিনি ওই সময় সিনেটে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের পরম বন্ধু হিসেবে বিবেচিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর শোকাহত পরিবারের বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা আমাদের পরিবারের এমন

এক সদস্যকে হারিয়েছি যার স্থান কখনো পূরণ হবে না। তিনি ছিলেন আমাদের জীবনের আনন্দের আলো। তার প্রেরণা, বিশ্বাস, প্রত্যাশা সারাজীবন আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে। মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড ম্যুর কেনেডির মৃত্যুতে বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষেই একজন অকৃত্রিম বন্ধুকে হারাল। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের পাশে এসে দাঁড়ানো ছাড়াও এ দেশের জনগণের নানা বিপদে-আপদে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি। সেজন্য বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ের অনেক গভীরে তাঁর স্থান। এ বাঁধন যাবে না ছেঁড়া।

পাকিস্তানিদের গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রথম বক্তব্য প্রদানকারী : বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের গণহত্যার বিরুদ্ধে এডওয়ার্ড কেনেডির প্রথম বক্তব্য তুলে ধরেন ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল মার্কিন কংগ্রেসে। মুক্তিযুদ্ধের আগাগোড়া তিনি মার্কিন প্রশাসনের ভূমিকার বিরুদ্ধে কেবল সোচ্চারই ছিলেন না, তিনি বরং রেখেছিলেন সক্রিয় ভূমিকাও। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন নির্বিচারে বাঙালি নিধন করছিল, প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন তখন পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে ওই হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রাখতে সহায়তা করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের হাতেগোনা যে ক'জন প্রভাবশালী সিনেটর সেই নৃশংসতার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিনেটর কেনেডি। সে-সময় এডওয়ার্ড কেনেডি ছিলেন সিনেটের শরণার্থীবিষয়ক উপকমিটির চেয়ারম্যান। তবে তার কর্মকাণ্ড শরণার্থীদের ভালো-মন্দ দেখাশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সিনেটর কেনেডি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়া বাঙালিদের শরণার্থী শিবির পরিদর্শনেও এসেছিলেন।

মানবতাবাদী প্রাণ আমেরিকান প্রশাসনের যুদ্ধবাদী অংশটির ঘোরবিরোধী ছিলেন এডওয়ার্ড কেনেডি। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খুবই সোচ্চার। নিজেকে একজন মানবতাবাদী বলে পরিচয় দিতেই পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, আমার অন্য কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্ম মানবতাবাদ।' আর উদার গণতন্ত্রী মানবতাবাদী চেতনাই একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ঘোরবিরোধিতা সত্ত্বেও মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি অসহায় মানুষের পাশে তাকে দাঁড় করিয়েছে। মুক্তিকামী বাঙালিদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্য তিনি সেই একাত্তর

সালে কলকাতায় এবং মুজিবনগরে ছুটে এসেছিলেন এবং কাদাপানির মধ্যে দীর্ঘপথ হেঁটে শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীশিবিরে ঘুরে ঘুরে তিনি অভয় দিয়েছেন বাঙালিদের। বিভিন্ন দেশে গিয়ে এসব শরণার্থীর জন্য সাহায্য চেয়েছেন। বলেছেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম নির্যাতনের কথা। তিনি ঘোর বিরোধিতা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র বলে পরিচিত পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নিপীড়নের। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সমর্থন নিক্সন-প্রশাসনের সম্প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা ব্যর্থ করে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মার্কিন জনমত ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

গ্রহণযোগ্যতা : এডওয়ার্ড একজন ডেমোক্র্যাট সিনেটর হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র এবং তার নাগরিকদের জন্য যা কিছু কল্যাণধর্মী বলে বিবেচনা করেছেন তা আদায়ের জন্য প্রয়োজনে রিপাবলিকানদের সঙ্গে একত্রে মিলে কাজ করতেও তিনি কখনোই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি বলতেন, 'নিখুঁতভাবে পাইতে গিয়ে যতটুকু ভালো সেইটুকুকে হাতছাড়া করার তো কোনো মানে হয় না।' মার্কিন রাজনীতির উদার নৈতিকতাবাদের এক অপূর্ব প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দুর্ভাগ্য-পীড়িত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধা আদায় এবং দেশে-বিদেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন নিরলস যোদ্ধা। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদ লাভ তার জন্য খুব কঠিন বিষয় ছিল না। কিন্তু দুই ভাইয়ের হত্যাকাণ্ড এবং তার প্রতি হত্যার হুমকি ইত্যাদি কারণ ছাড়াও নিহত ভাইদের সন্তান-সন্ততিদের মানুষ করার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রতিবারই তিনি নির্বাচনী প্রার্থিতা লাভের লড়াই থেকে কোনো-না-কোনো পর্যায়ে সরে দাঁড়িয়েছেন।

অবদান নাগরিক অধিকার, স্বাস্থ্য ও আমেরিকার নাগরিকদের অর্থনৈতিক কল্যাণে প্রায় সব মিলে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাছেও তিনি রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের শিক্ষা সংস্কারে সমর্থন দিয়েছিলেন। মার্কিন সিনেটে তিনি বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম ও পেনশন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতটির দিকেই ছিল তার সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য। আমৃত্যু তিনি এ স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের

স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করে গেছেন। ২০০৮-এ তাঁর শরীরে মরণব্যাধি ক্যান্সার ধরা পড়ে। কিন্তু ব্যাধি বা মৃত্যুভয় তাঁকে দমাতে পারেনি। আমৃত্যু তিনি প্রগতিশীল রাজনীতি ও মানবাধিকারের পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থান ধরে রেখেছেন।

বাংলাদেশের জনগণের বন্ধু ২০০৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ জন শিক্ষকের গ্রেফতার ঘটনাও এডওয়ার্ড কেনেডিকে বিচলিত করেছিল। এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ব্যতিক্রমী রাজনীতিক ছিলেন।

শেষ কথা : এডওয়ার্ড কেনেডির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন রাজনীতি থেকে একজন জনদরদী ও দক্ষ আইন প্রণেতার তিরোধান ঘটলেও তার অর্জনগুলো যুক্তরাষ্ট্রবাসীর কাছে অনির্বাণ দীপশিখা হয়ে জ্বলতে থাকবে। জীবদ্দশায় টেড ছিলেন অশুভের স্থানে শুভকে প্রতিষ্ঠা, মানুষের দুর্দশা মোচনের কাজে সদাসচেষ্ট, যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধের জন্য প্রবল প্রত্যাশী এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের জন্ম থেকেই এডওয়ার্ড কেনেডি আমৃত্যু ছিলেন এ দেশটির সুখ-দুঃখের সুহৃদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ তাঁকে উল্লসিত করেছে, আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির জনকের মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। বাংলাদেশের মানুষ তাদের দুর্দিনের এই সুহৃদকে চিরকাল সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে। বিশ্বের শান্তিকামী, গণতন্ত্রকামী মানুষের মনে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। তার প্রেরণা, প্রত্যাশা ও বিশ্বাস বেঁচে থাকবে চিরকাল। আজন্ম আশাবাদী ও মানবতাবাদী বিশাল হৃদয়ের এ মানুষটির স্মৃতির প্রতি রইল আমাদের গভীর শোক ও শ্রদ্ধা।

দৈনিক ডেসটিনি : ৫ সেপ্টেম্বও, ২০০৯

স্যালুট টু এডওয়ার্ড কেনেডি

বিলু কবীর

মার্কিন সিনেটর, যাকে উন্নত বিশ্বের গণতন্ত্রী নেতারা 'সিনেটরদের সিনেটর' বলে থাকেন। তিনি এডওয়ার্ড কেনেডি। গত ২৫ আগস্ট তিনি পরলোকগমন করেছেন (তার আত্মার শান্তি হোক)। তাঁর রাজনৈতিক জীবন যেভাবে তাঁকে খ্যাতি দিয়েছে, মার্কিন সিনেটর হিসেবে মানবিক প্রশ্নে তিনি নিজ দেশের সরকারের পর্যন্ত বিরোধিতা করেছেন। আর্তের অনুকূলে আইন ও সিদ্ধান্ত নির্মাণে তিনি রাজনৈতিক গণমুখিতা প্রদর্শন করেছেন সারাজীবন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সমগ্র পরিবারের অবদান, অবস্থান, ঐতিহ্য এবং জনপ্রিয়তা কিংবদন্তিতুল্য। তার দৃঢ় মানসিকতা, তার সাহসী রাজনৈতিক ঔচিত্যবোধের যে অভিব্যক্তি তা সত্যিকার অর্থেই তাঁকে বিশ্বনন্দিত করে তুলেছে। সেই মহান মানুষটা যখন পরলোকগমন করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবী ব্যথিত হবে, মিডিয়া ভালো কাভারেজ দেবে, এটাই স্বাভাবিক।

১৯৭১ সালে আমেরিকা যখন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল তখন টেড কেনেডি নামে সমধিক পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রেরই সিনেট সদস্য এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। সিনেট সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ভারত সফর করে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেছিলেন এবং শরণার্থীদের অবর্ণনীয় কষ্ট এবং দেশের জন্য প্রচণ্ড কষ্টকল্পিত বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করতে দেখে যুগপৎভাবে বিস্মিত এবং ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন সিনেট সভায় উপস্থাপন করে আমেরিকান সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াটা দুষ্কর্ম করার সামিল। পাকিস্তানকে সমর্থন করাটা বর্বরতাকে সহায়তা করার সমান্তরাল। তিনি ওই সময় আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে বিবৃতি দিয়েছিলেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

আর তাকে নিয়ে লিখতে বসায় যে আন্তরিক তাড়না সেটা হচ্ছে ১৯৭২ সালে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে এসেছিলেন। মনে পড়ে, মাত্র দুই দিনের সফরে এসে উনি কুষ্টিয়ায় গিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে দেখেছিলাম খুব

কাছ থেকে কুষ্টিয়ায় আমার বাড়ি হওয়ার সুবাদে। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। সেই দিনটির স্মৃতি যে আজ এভাবে লেখার বিষয় হয়ে উঠবে তা কখনো ভাবনায় ছিল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ এদেশের মানুষের অবর্ণনীয় ক্ষতি এবং লড়াকু রক্তাক্ত হৃদয়কে অনুধাবন করে তিনি যে ব্যথিত হয়েছিলেন, তারই প্রকাশ ঘটাতে তিনি এদেশের দুঃখী এবং বীর মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তারই সূচক হলো তিনি ব্যাপক ভ্রমণ ও বৈঠকসূচি নিয়ে মাত্র ২ দিনের সফরে এসেছিলেন বাংলাদেশে। ওই দুই দিন ছিল ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ এবং ১৫ তারিখ। সেই দু'দিনে তিনি যা যা করেছিলেন তা হলো– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন এবং ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময়, কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি (এখন যেটা অইসিডিডিআরবি) পরিদর্শন, ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে যাওয়া, সাভারে গণকবর দেখতে যাওয়া, নারায়ণগঞ্জে খাদ্য গুদাম ও বন্দরব্যবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করা, সংবর্ধনায় উপস্থিত থাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষ্যাৎ করা, ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষ্যাৎ করা, নৈশভোজে অংশগ্রহণ করা, মিসেস কেনেডির বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে (৩২ নম্বর বাসভবন) যাওয়া। মাত্র দুই দিনের এত দীর্ঘ প্রোগ্রামের মধ্যে আরও একটি কাজ এডওয়ার্ড কেনেডি করেছিলেন সেটা হলো কুষ্টিয়ায় যাওয়া। তিনি জেনেছিলেন, বাংলাদেশের যেসব জেলা শহরে মুক্তিযুদ্ধে খুব বেশি রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কুষ্টিয়া তাদের মধ্যে একটি। যে শহরটি পুরোটাই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং যার চিত্রপটকে ২য় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো শহরের সঙ্গে তুলনা করে আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে খবর ছাপা হয়েছিল। এমতাবস্থায় এডওয়ার্ড কেনেডি বিধস্ত কুষ্টিয়াকে এবং সেখানকার শরণার্থীদের ফিরে আসা-উত্তর দুরবস্থা দেখতে এসেছিলেন। আমার মনে আছে, আমরা স্কুল থেকে ওই দিন (ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখ হবে) পুলিশ লাইন মাঠে গেলাম। অন্যান্য স্কুলের ছেলেমেয়েরা ও অন্যান্য সেক্টরের লোকেরাও সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। আমার খুব মনে আছে, সেই মাঠে শিল্পী আবদুল জব্বার উপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন উঠতি শিল্পী কম বয়েসী ফরিদা পারভীনও। সকালের দিকে একটি হেলিকপ্টার এসে নামল পুলিশ লাইনের মাঠে। আমরা হাত নাড়লাম, জ্বলেপুড়ে ছারখার কুষ্টিয়া জেলার পক্ষ হতে এই ছিল মামুলি অভিবাদন। হেলিকপ্টার থেকে নামলেন এডওয়ার্ড কেনেডি

এবং তার স্ত্রী জোন কেনেডি। সঙ্গে আরও এক যুবক ছিলেন। শুনেছিলাম তিনি নাকি এডওয়ার্ড কেনেডির ভ্রাতুষ্পুত্র। আন্দাজ করি ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামও ওই হেলিকপ্টারেই গিয়েছিলেন কুষ্টিয়ায়। তখন তিনি আরও বেশি সুদর্শন। আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সির পার্লামেন্ট মেম্বার এবং স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার খাদ্য প্রতিমন্ত্রী। আরও বেশ কয়েকজন ইংরেজকে সেদিন কুষ্টিয়ায় দেখেছিলাম। মানুষ যাকে দেখে তাকে কানাঘুষা করে বলে এই হলেন মার্ক টালি। এই হলেন উইলিয়াম ক্রলি। তখন কুষ্টিয়ার মানুষ দুজন ইংরেজকে নামে চিনত, তাদের অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল প্রফেশনের কারণে। তারা হলেন ওই সময়ে বিবিসির দক্ষিণ এশিয়া প্রতিনিধি মার্কটালি এবং উইলিয়াম ক্রলি। তাদের প্রতি ভীষণ দুর্বলতা ছিল বলেই তাদের একনজর দেখলে মনটা শান্তি হয় বিবেচনাতেই ওইদিন আমরা যাকেই ইংরেজ দেখেছি, তাকেই ভেবেছি এই বুঝি আমাদের মার্ক টালি, এই বুঝি আমাদের উইলিয়াম ক্রলি। কেনেডি কুষ্টিয়া ইউনাইটেড হাইস্কুলের মাঠে ভাষণ দিয়েছিলেন এই ঘটনার আগে বা পরে। কয়েকদিন পরই হবে। ওই একই মাঠে ভাষণ দিয়েছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মেম্বার জন স্টোনহাউজ। সেই সময় ওই মাঠে ছিলাম আমরা। জন স্টোনহাউজ বা এডওয়ার্ড কেনেডি, দুজনের একজন কেউ, তার পুরো ইংরেজি ভাষণের মধ্যে একটি বাংলা বাক্য বলেছিলেন। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট করে এই বাংলা বাক্যটি তিনি রপ্ত করে এসেছিলেন। বাংলাদেশে পাকসেনাদের বর্বতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন, আহ্মি খুপ ডুঃখা পাইছি (আমি খুব দুঃখ পেয়েছি)। তার এই ইংরেজি ধাঁচের বিকৃত বাংলায় আমরা মজা পেয়ে খুব একচোট হেসেছিলাম। কিন্তু বিষয়টি হাসির ছিল না। দুঃখের ছিল, আমাদেরই দুঃখে তার দুঃখপ্রকাশ ছিল। যাই হোক, সেই অকৃত্রিম বন্ধুটি আজ মারা গেছেন, আমরা তাঁকে হারালাম, আমেরিকা হারালো, পৃথিবী হারালো। এ বড় বেশি রকম হারানো। তার চিরশান্তি হোক। আত্মার মুক্তি হোক। পঞ্চাশ বছর ধরে রাজনীতিতে অবদান রাখা এই সিনেটর কেবল সিনেটরদের সিনেটর ছিলেন না, তিনি ছিলেন ব্রাত্যজনেরও সিনেটর, সংগ্রামী বঞ্চিত মানুষেরও প্রতিনিধি। তার অন্য দুই ভাই প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি এবং সিনেটর রবার্ট কেনেডি। এক ভাই প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি আততায়ীর হাতে নিহত হন। সে হচ্ছে ১৯৬৩ সালের কথা। অন্য ভাই রবার্ট কেনেডি নিহত হন ১৯৬৮ সালে। তাদের অপর ভাই ছিলেন

বৈমানিক, তিনিও মারা গিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। এই ভাইয়ের নাম ছিল জো কেনেডি। অর্থাৎ কেনেডিরা যে চার ভাই ছিলেন, তাদের মধ্যে তিন ভাই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, দুই ভাই সিনেটর, এক ভাই বৈমানিক। এই চার ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র এডওয়ার্ড কেনেডি ছাড়া অন্য কারোরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। প্রেসিডেন্ট ভাই এবং পরের সিনেটর ভাই দু'জনই নিহত হওয়ার পর (বৈমানিক ভাই তো ১৯৪৪ সালে মারা গেছেন, আগেই) তিনি রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। তারা ছিলেন নয় ভাই বোন। ভাই জন কেনেডি যখন ১৯৬২ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন, তখন তিনি ম্যাসাচুসেটসের সিনেটরের পদটি ছেড়ে দেন। সেই পদে এডওয়ার্ড কেনেডি নির্বাচিত হয়ে ৩০ বছর বয়সে আমেরিকার ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ সিনেটর হওয়ারও সম্মান অর্জন করেন। এরপর তিনি মোট সাতবার সিনেটর হিসেবে নির্বাচিত হন। অর্ধশতাব্দীর রাজনীতিক হিসেবে তাঁর যে অবদান, তার যে জনপ্রিয়তা, তা ব্যাপক হলেও প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না, তার পার্টি মনে করেছিল। কারণ, ১৯৮০ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে তাতেও ক্ষতির চেয়ে লাভের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। এই সময় তিনি 'Dream will never die' শীর্ষক একটি ভাষণ দিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন আরও। তিনি পঞ্চাশ বছর সিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। এই দীর্ঘপর্বের সময়টি নানা কাজে বর্ণাঢ্য ছিল, গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অভিবাসন, ন্যূনতম মজুরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নাগরিক অধিকার এসব বিষয়ে তিনি সিনেটর জীবনে অবদান রেখেছেন এবং রাখার চেষ্টা করেছেন। উত্তর আয়ারল্যান্ডের শান্তি প্রক্রিয়ায়ও তার অবদান অবিস্মরণীয় কাজ। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইমিগ্রান্টদের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে তিনি সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। ১২ মিলিয়ন অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতা দেয়ার বিল এনেছিলেন তিনি। যদিও সেটা পাস হয়নি। তার জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা কতটা ছিল তা বোঝা যায় ২০০৬ সালে টাইম ম্যাগাজিনের জরিপে। তাতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ১০ সেরা সিনেটরের মধ্যে একজন নির্বাচিত হন। এছাড়া তার গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তার সূচক হিসেবে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

তা হলো ১২ আগস্ট ২০০৯ তারিখে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক নাগরিক সম্মাননা 'দ্য প্রেসিডেন্টশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম

এডওয়ার্ড' দেয়া হয়। আমি যদ্দূর জানি এই বিরল সম্মান এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে মাত্র ছয় জন পেয়েছেন। তিনি যে তার ন্যায়বোধের তাড়নায় বারবারই নিজের দেশীয় সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তার আরেক ইন্ডিকেটর হলো ২০০2 সালে তিনি ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। যাতে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকানদের মতামতেরই প্রতিফলন ঘটেনি, প্রতিফলন ঘটেছে বিশ্বমানবের। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বমাপের একজন নেতা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকায় এবং সারাপৃথিবীতে তার যে অবস্থান, তার যে মানবিক বিচক্ষণতা, তার যে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মূল্যবোধ, তার যে বাকনির্ভীকতা, তাতে করে আমি দৃঢ়বিশ্বাসী যে, আমেরিকার রাজনীতিতে তার পরিবারের যে ভূমিকা, ক্ষতি স্বীকার, ঐতিহ্য এগুলো না থাকলেও তিনি এমনই জনপ্রিয় হতেন। অতীত পটভূমি বা পারিবারিক ভাবমূর্তি তাকে এই পর্যায়ে উন্নীত হতে সহায়তা করেছে অবশ্যই। কিন্তু সেটাই তার মূল বা একমাত্র ভিত্তি নয়। বলতে চাইছি যে, তার অতীত নয়, বরং প্রতিদিনের বর্তমান কাজকর্মই তিলে তিলে তাকে একটা ভিত্তিভূমি গড়ে দিয়েছিল। তার শেষকৃত্যে বর্তমান ও সাবেক মিলিয়ে উপস্থিত চারজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সে মন্তব্য করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানসহ নেতা-নেত্রীরা যেসব বক্তব্য সমৃদ্ধ সমবেদনা জানিয়েছেন, তার দিকে লক্ষ করলে সেটা অনায়াসেই অনুধাবন করা যায়।

আহা! পৃথিবীর সব নেতা যদি তাঁর মতো হতেন।

দৈনিক সংবাদ : ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

সেকেন্দার মতিউর রহমান

বিগত ২৫ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ৭৭ বছর বয়সে ব্রেন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ১৯৩২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বোস্টন নগরীতে একটি সম্পদশালী রাজনৈতিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তারা ক্যাথলিক ধর্ম-বিশ্বাসে বিশ্বাসী। তার পিতা যোশেফ পি কেনেডি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের শাসনামলে গ্রেট ব্রিটেনে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তার বড়ভাই জন এফ কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং আর এক বড় ভাই বরার্ট কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি জেনারেল ছিলেন। দুজনই আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। এডওয়ার্ড কেনেডি ১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সিনেটর হিসেবে নির্বাচিত হন এবং বিগত ৪৭ বছর ধরে সিনেটর হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি অনেক জনহিতকর আইন প্রণয়নের উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ওইসব আইন পাসের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের দরিদ্র জনগোষ্ঠী অত্যন্ত উপকৃত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রতিও তিনি অতন্দ্র দৃষ্টি রাখতেন। এডওয়ার্ড কেনেডি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে অবদান রাখেন। উত্তর আয়ারল্যান্ডে শান্তি স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। চিলিতে যখন জেনারেল পিনোশের একনায়কত্ব কায়েম ছিল তখন তিনি সেখানে অস্ত্র বিক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যবস্থা করেন। ২০০2 সালে এডওয়ার্ড কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাকে যুদ্ধ আরম্ভের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করেন।

বহির্বিশ্বে তার সবচেয়ে স্মরণীয় উদ্যোগ ছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সার্বিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও মুক্তিকামী মানুষকে সহযোগীতা করা। পাকিস্তান সামরিকবাহিনী যে পূর্ব বাংলায় গণহত্যা চালাবে তা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনিসুর রহমান বহু আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং তিনি আসন্ন গণহত্যা রোধে তার বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী অধ্যাপক রবার্ট গাইসকে সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের কাছেও পত্রিকায় চিঠি পাঠানোর উদ্যোগ নিতে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক রবার্ট গাইস বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ

করেন। অধ্যাপক আনিসুর রহমানের 'পথে যা পেয়েছি' প্রথম পর্ব নামীয় আত্মস্মৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে অধ্যাপক গাইস এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মকর্তাদের পূর্ব বাংলায় আসন্ন গণহত্যারোধে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য পত্র লিখেছিলেন তার মধ্যে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডিকে লেখা চিঠিটি অধ্যাপক গাইস ১৯৭১ সালের ১৮ মার্চ তারিখে সিনেটর কেনেডিকে প্রেরণ করেন। উত্তরে সিনেটর কেনেডি অধ্যাপক রবার্ট গাইসকে নিম্নবর্ণিত পত্র প্রেরণ করেন যা নিম্নে অধ্যাপক আনিসুর রহমানের বই থেকে উদ্ধৃত করা হলো :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিনেট
ওয়াশিংটন ডিসি
২, জুন, ৯৭১
প্রিয় মি. গাইস

পূর্ব পাকিস্তানের বিরাট মানবিক ট্র্যাজেডির ওপর আপনার সাম্প্রতিক চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ।

আমি অবশ্যই আপনার গভীর উদ্বেগ শেয়ার করি এবং আপনি বোধহয় জানেন যে আমি প্রথম থেকেই আমাদের সরকার ও আন্তর্জাতিক মহল কর্তৃক এই অঞ্চলের জনগণের দুরবস্থা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছি। ১ এপ্রিল থেকে জুডিশিয়ারি সাব-কমিটি অব রিফিউজিস, যার সভাপতি আমি– প্রথমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত এই জনগণের সমস্যাবলির ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। আপনার আগ্রহ বিধায় পূর্ব পাকিস্তানের ট্র্যাজেডির ওপর আমি সাম্প্রতিককালে যেসব বিবৃতি দিয়েছি সেগুলোর কপি সঙ্গে দিলাম। আপনার চিঠির জন্য আবার ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছায়,

এডওয়ার্ড এফ কেনেডি'

উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়াও এডওয়ার্ড কেনেডি প্রকাশ্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন প্রদান করেন এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পূর্ব পাকিস্তানবিরোধী কর্মকাণ্ড ও পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদানের বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে চলে আসেন এবং ১৯৭১ সালের ৮ আগস্ট তিনি পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করে পূর্ববাংলার বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর দুর্দশা দেখেন। তাদের ওপর পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক পাশবিক নির্যাতনের কথা শুনে তিনি অশ্রু সম্বরণ করতে পারেননি।

এই বিপুল মানসিক বিপর্যয় বিবৃতির মাধ্যমে তিনি বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন। তিনি আরও জানান, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায়

ব্যাপকহারে গণহত্যা চালাচ্ছে। শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনের পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে সিনেটে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে অনুসৃত নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রশাসন যে পাকিস্তানকে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম দমনের জন্য অস্ত্র, সাহায্য দিচ্ছে তারও তিনি প্রতিবাদ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন পাকিস্তান সরকারকে অব্যাহত সমর্থন দেয়ার ফলেই পূর্ব বাংলায় মানবিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটছে। বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর ভার বহন করা ভারতের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে তিনি একটি বৃক্ষরোপণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় নিক্সন সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করলেও বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল এবং নৈতিক, আর্থিক ও মানবিক সাহায্য দান অব্যাহত রেখেছিল।

এই মানবতাবাদী নেতার মৃত্যু বিশ্ববাসীর জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তার অবদানের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রতি তার সুদৃষ্টি অব্যাহত ছিল।

বাংলাদেশের সুশীল সমাজ এডওয়ার্ড কেনেডির স্মরণে একটি নাগরিক শোকসভার আয়োজন করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আমাদের বন্ধু সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। তাদের মধ্যে এডওয়ার্ড কেনেডি ছিলেন একজন। তার এই অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করতে পারে।

দৈনিক সংবাদ : ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সিনেটর টেড কেনেডি ফিরে দেখা

জুলিয়ান ফ্রান্সিস

জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন ম্যাসাচুসেটস থেকে নয়বার নির্বাচিত প্রয়াত মার্কিন সিনেটর টেড কেনেডি (১৯৩২-২০০৯)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল রাইটস আইনের বিষয়বস্তু পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে আপসহীন মনোভাবের জন্য 'লায়ন অব সিনেট' হিসেবে পরিচিত মহান এ মানবপ্রেমীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ করে দিয়েছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম। ভারতের পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের নির্মম আগ্রাসনের শিকার দুর্দশাগ্রস্ত শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ত্রাণকার্য পরিচালনা করছিল অক্সফাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যগুলোতে স্থাপিত ৯০০ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ৫০ লাখ অসহায় মানুষকে সহায়তা করতে অক্সফামের নেওয়া রিফিউজি রিলিফ প্রোগ্রামে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছিলাম, সে-সময় বাংলাদেশে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র একবছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটেনকেন্দ্রিক অক্সফামের সহযোগী সংগঠন অক্সফাম আমেরিকা। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং মানবসেবার সুবিশাল কর্মপরিধিতে অক্সফাম আমেরিকার পদযাত্রার সূচনা প্রায় সমসাময়িক।

ত্রাণকার্যে প্রচুর সহায়তা প্রদান করা অক্সফাম আমেরিকার কর্মকাণ্ড ব্যাপকতা লাভ করে মার্কিন সিনেটর শরণার্থী সংক্রান্ত সাব-কমিটির সদস্য সিনেটর টেড কেনেডি ১৯৭১ সালের আগস্টে ভারতে অবস্থিত শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনে আসার পর। পরিদর্শন শেষে টেডের দেওয়া বর্ণনায় বন্যায় ডুবে যাওয়া শিবিরগুলো দুর্দশার চূড়ান্ত সীমায় অবস্থান করা শরণার্থী ও তাদের সহায়তায় আসা ত্রাণকর্মীদের অবস্থা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। কলকাতা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে তার সফরসঙ্গী হওয়ার সুবাদে তাকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়। অন্যসব মার্কিন আইন প্রণেতা ও রাজনীতিবিদদের মতো বাংলাদেশের চলমান মানবিক বিপর্যয় সম্পর্কে অজ্ঞ টেডকে বিচলিত করে তোলে দুর্দশাগ্রস্থ শরণার্থী শিবিরগুলো। এ-সফরেই শরণার্থীদের ভয়াবহ করুণ অবস্থা তাকে আগের অবস্থান থেকে সরে যেতে বাধ্য করার

পাশাপাশি পরিস্থিতি ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। 'স্মরণকালের ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়'-শরণার্থী শিবির পরিদর্শন শেষে ফেরা টেড কেনেডিকে ১৪ আগস্ট এভাবেই উদ্ধৃত করে লন্ডন টাইমস।

শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের পর তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরন সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন টেড কেনেডি। সে সময় সংবাদ মাধ্যমে আলোচিত শেখ মুজিবের গোপন বিচার নিয়ে সোচ্চার হন তিনি। সংবাদমাধ্যমকে টেড বলেন, আমার মনে হয় একমাত্র নির্বাচনে জয়লাভ করার অপরাধে দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে শেখ মুজিবকে। আর নিশ্চিতভাবেই তাকে দোষী সাম্যস্ত করার জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনালের গোপন কার্যক্রম আন্তর্জাতিক আইন বহির্ভূত এবং এর ওপর আস্থাশীলদের প্রতি রসিকতা।

এ-সময় প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রশাসন কর্তৃক পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের সর্বাত্মক বিরোধীতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টেড বলেন, দেশে ফিরেই আমি সিনেটের মাধ্যমে পাকিস্তানে অস্ত্র বরবরাহ বন্ধ ছাড়াও চলমান সহিংসতার রাজনৈতিক সমাধানের আগ পর্যন্ত দেশটিতে সব ধরনের আর্থিক সহায়তা স্থগিতের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।

ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশী শরণার্থী ও দেশটির অভ্যন্তরে সীমানা পাড়ি দেওয়ার অপেক্ষায় থাকা শঙ্কিত মানুষের প্রকৃত চালচিত্র তুলে ধরে বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তোলার অংশ হিসেবে প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গের অনুভূতি সংগ্রহ ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয় অক্সফাম- যা সফলতায় রূপ নেয় সে বছর অক্টোবরের ২১ তারিখ 'টেস্টিমনি অব সিক্সটি' বা ষাটের সাক্ষ্য প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে। সে বছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উদ্বোধনীতে উপস্থিতদের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া কাগজ অব মিজারি শীর্ষক বিবৃতিতে টেড জানান তার বনগাঁও শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা। তার বিবৃতিতে বিপর্যস্ত মানবিকতার প্রতিচিত্র ফুটে ওঠে এভাবেই, জীবনের ভয়ে দিনরাত ছুটে চলার ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত ছেলে-বুড়ো সবাই। অবিন্যস্ত বিন্যাসে রাস্তার ধারে বসে থাকা লক্ষ্যহীন, শোকার্ত ও ঘরছাড়া মানুষগুলো অজানা ভবিষ্যৎ চিন্তায় শঙ্কিত। তাদের মুখে মুখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও দোসরদের নির্মমতা, লুটপাট, নির্যাতন ও নিজেদের অসহায়ত্বের কাহিনী। পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা অনেক শিশুর পিতা-মাতাদের করুণ মুখে ছিল জীবনধারণের জন্য যৎসামান্য

সহায়তা পাওয়ার আকুতি। মৌসুমি বৃষ্টিতে নিমজ্জিত দেশ বাড়াচ্ছিল তাদের হতাশা এবং অসহায়ত্ব। আমরা যারা সেদিন সেখানে ছিলাম, বৃষ্টিতে তাদের প্রয়োজন ছিল কেবল শুষ্ক কাপড়। আর ভয়াবহতম মানবিক বিপর্যয়ের শিকার অসহায় শরণার্থীদের জন্য নিশ্চিতভাবেই অপেক্ষা করছিল আরও একটি ক্ষুধার্ত, আশ্রয়বিহীন নির্ঘুম দীর্ঘ রজনী। বিবৃতির শেষাংশে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ে সাড়া দিয়ে এর দায়ভার নেওয়ার আহ্বান জানান সিনেটর টেড কেনেডি।

পরের সপ্তাহে আবার মার্কিন সিনেটে টেস্টিমনি অব সিক্সটি বা ষাটের উপস্থাপন করেন টেড কেনেডি। শুধু তা-ই নয়, তিনি সিনেটকে বাংলাদেশে চলমান মানবিক বিপর্যয়ের প্রমাণ হিসেবে টেস্টিমনি অব সিক্সটি সংরক্ষণের আহ্বান জানান। পরে বিষয়বস্তুর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই পুরো ডকুমেন্ট ৯২তম কংগ্রেসের আলোচনার অংশ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়। এগুলো নিজের প্রতিশ্রুতিলব্ধ সিনেটর কেনেডির কর্মকাণ্ডের সামান্য উদাহরণ।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আরও একবার বাংলাদেশে আসেন টেড কেনেডি। যুদ্ধের কালো থাবায় রক্তাক্ত সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া ভাষণে দেশটির পুনর্গঠনে সব ধরনের সহায়তার প্রতশ্রুতি দেন তিনি। বাংলাদেশের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেওয়া অসাধারণ এ ব্যক্তিত্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমৃত্যু সচেষ্ট ছিলেন।

দৈনিক সমকাল : ২৬ মার্চ, ২০০১

বাংলাদেশ সফরে কেনেডি

তপন কুমার দে

১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সফরে আসেন কেনেডি। তাঁর সাথে আরো আসেন স্ত্রী মিসেস জোয়ান কেনেডি, ভ্রাতুষ্পুত্র জোসেফ কেনেডি। এ দিন ঢাকার আকাশ ছিল বেশ মেঘলা, কোনো কোনো সময় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল, আবার এর সাথে জোরে জোরে বাতাসও বইছিল। আরও ছিল কনকনে শীত। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মাঝেও কেনেডি দম্পতিকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য সর্বস্তরের মানুষ ভিড় জমায় বিমানবন্দরে।

সকাল ১০টায় পরবর্তী বিমানে কলকাতা থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেন কেনেডি। তার বিমান দেখার সাথে সাথে উপস্থিত জনতা জয়বাংলা শ্লোগান দিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। জনতা শুধু জয় বাংলাই বলেনি, তারা কেনেডির নামেও শ্লোগান দেয়, জয় কেনেডি বলে। তিনি বিমান থেকে নামার সাথে সাথে তাকে দেখা এবং মাল্যদানের জন্য জনতা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। যার জন্য তাকে যে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানোর কথা তা প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় জনতার বিশাল ভিড়ে। পরে অনেক কষ্ট করে জনতাকে সরিয়ে তাকে অভ্যর্থনাস্থলে নিয়ে আসা হয়।

তাকে অভর্থনা জানান, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাণিজ্যমন্ত্রী এম. আর. সিদ্দিকী ও তার স্ত্রী, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানান আব্দুর রাজ্জাক এমসিএ ও মিসেস বদরুন্নেসা এমসিএ, ন্যাপের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানান ন্যাপ নেতা জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ।

আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য লালগালিচা পেতে সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও জনতার ভিড় সামলিয়ে কেনেডিকে লালগালিচায় নেয়া সম্ভব হয়নি। যার জন্য লালগালিচায় অপেক্ষমাণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। জনতার ভিড়ের জন্য দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরাও কেনেডির কাছে যেতে পারেনি। সরকারি কর্মকর্তারা তাঁকে বহু কষ্ট করে একটি গাড়িতে তুলে দেয়। উক্ত গাড়িতে চড়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন।

বেলা প্রায় ১২টার দিকে কেনেডি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে এসে পৌঁছেন। কেনেডিকে এক নজর দেখার জন্য কাকডাকা ভোর থেকে ছাত্র, শিক্ষক ও সর্বস্তরের লোকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে এসে হাজির হতে থাকে। এক পর্যায়ে তা এক বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

বেলা ১১টা ৪৬ মিনিটে কেনেডি পৌঁছান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁকে দেখামাত্র চারদিক থেকে তাঁর ওপর বর্ষণ করতে থাকে পুষ্পবৃষ্টি। তুমুল জয়বাংলা শ্লোগান দিয়ে তারা তাঁকে অভিনন্দন জানায়। প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে তিনি ঐতিহাসিক বটতলায় মঞ্চের দিকে যান এবং সেখানে গিয়ে বসেন। এ-সময় তাঁর সাথে ছিল স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্র। হলুদ শাড়িপরা কয়েকজন ছাত্রী তাদের মাল্যদানে ভূষিত করে। উপস্থিত ছাত্রজনতা বিপুল করতালি আর শ্লোগান দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে মুখরিত করে তোলে।

দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে কেনেডি মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এ সময় আবারও করতালি ও শ্লোগান দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।

ছাত্রজনতা শ্লোগান দেয় জয়বাংলা, জয় কেনেডি। সেখানে চারদিক থেকে তাঁর উপর ফুলের পাঁপড়ি ছুড়ে দেওয়া হয়। বলা চলে, ফুলের পাঁপড়িতে তাঁর পোশাক ছেয়ে যায়। এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তিনি। বক্তব্য শেষে তিনি কলাভবনের প্রাঙ্গণে একটি বটগাছের চারা রোপণ করেন। সে গাছটি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রামের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলাদেশ সফরকালে কেনেডি ১৪ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। তারা দুজনে প্রায় ৮০ মিনিট আলাপ-আলোচনা করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বঙ্গবন্ধু বলেন, কেউ স্বীকৃতি দিক বা না দিক বাংলাদেশ টিকে থাকার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। কেনেডি সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা সরকার আর বেশি বিলম্ব করবে না। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচারের কাহিনী শুনে ও চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন বলেও সাংবাদিকদের জানান।

আতিথেয়তার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন যে, তাঁর স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের গুণমুগ্ধ ভক্ত। বৈঠকের আগে বঙ্গবন্ধু তাঁর সরকারি গণভবনে

কেনেডি, মিসেস কেনেডি ও তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্রকে অভ্যর্থনা জানান। অভ্যর্থনা জানানোর সময় পিতাকে পরাজিত করে পুত্র রাসেল পিতার আগেই দ্রুত গিয়ে কেনেডিকে স্বাগতম জানায়।

বঙ্গবন্ধু কেনেডির সাথে তাঁর দুই পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামালকে পরিচয় করে দেন। আরও পরিচয় করে দেন তার রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদকে।

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বাংলাদেশ সফর শেষে কেনেডি চলে যান। যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, আমেরিকা যাতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় তার জন্য চেষ্টা চালানোর পদক্ষেপ নিয়ে তিনি তাঁর দেশ ও সিনেটে ফিরে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, অনেক আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল আমেরিকার। বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতাসমূহকে কেনেডি বলেন যে, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের ভীত গড়ার ব্যাপারে তাদের সংকল্প সম্পর্কে তিনি মার্কিন সিনেট পক্ষ ও তাঁর দেশের জনগণকে অবহিত করবেন।

–সমাপ্ত–